গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১৪ - ২০ জানুয়ারি, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পরিবহণ যাত্রীদের নিজস্ব সংগঠন গঠিত হল

বারবার পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধির চাপে ন্যুব্জ জনসাধারণের মধ্য থেকে দাবি উঠছিল সংগ্রামী যাত্রী কমিটি গঠনের। অভিজ্ঞতা থেকে যাত্রীরা বুঝতে পারছিলেন সংগঠিত বাসমালিকদের সঙ্গে রাজ্যের শাসক সিপিএমের একটা জনবিরোধী বোঝাপড়া আছে। যার ফলে বার বার যাত্রীদের ওপর ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা রাজ্য সরকার চাপাতে সক্ষম হচ্ছে; অসংগঠিত থাকায় যাত্রীদের মার খেতে হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে যাত্রীদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে ৭ জানুয়ারি কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে নাগরিক কনভেনশনে।

কনভেনশনের প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে — সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার আবার রাজ্যের পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে চলেছে। সংবাদে প্রকাশ, পরিবহণ দপ্তরের অফিসারেরা বাসভাড়া কোন স্টেজে কতটা বাড়ানো যেতে পারে তার একটা খসড়া ইতিমধ্যেই রচনা করেছেন এবং তার ভিত্তিতে পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে বাস-মালিকদের দু-বার বৈঠকও হয়ে গিয়েছে। এখন সিদ্ধান্ত ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ কর-দর-মূল্যবৃদ্ধির ভয়ানক চাপে দিশাহারা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ ক্রমশই তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কর্মচ্যুত শ্রমিক ও দেনাগ্রস্ত কৃষক এই রাজ্যে আত্মহত্যার বেদনাদায়ক পথ গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন। গ্রামবাংলায় অনাহার অর্ধাহার এখন মানুষের নিত্যসঙ্গী। এই পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত ভাড়াবৃদ্ধির এই নয়া সিদ্ধান্ত সংকট জর্জরিত সাধারণ মানুষের জীবনের সংকটকে আরও তীব্রতর করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাবকে অন্যায় ও অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে প্রস্তাবে বলা হয়েছে — ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাসভাড়া না বাড়িয়ে কোন উপায় নেই বলে বলা হচ্ছে। অথচ ঘটনা হল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কর নীতি। এই রাজ্যে এক লিটার ডিজেলের দাম ২৮.৭২ টাকা — যার মধ্যে ১১ টাকার বেশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর।

পাঁচের পাতায় দেখুন

তামিলনাড়ু ও কেরালায় এস ইউ সি আই-এর ত্রাণশিবির

সুনামি বিধ্বস্ত এলাকায় অত্যন্ত জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রশ্নে এক নিষ্ঠুর বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। একদিকে জনসাধারণের মধ্যে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আকৃতি ফুটে উঠছে, অন্যদিকে সরকার ও প্রশাসনের নির্লজ্জ অবহেলার বাস্তব চেহারা বেরিয়ে এসেছে।

সর্বস্বান্ত বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সাধারণ মানুষ যে কতটা উদ্‌গ্রীব, ত্রাণ সংগ্রহের কাজে নেমে দলের কর্মীরা তার পরিচয় পেয়েছেন। জনসাধারণ মুক্তহস্তে সাহায্য করেছেন শুধু নয়, এস ইউ সি আই কর্মীদের হাতে তুলে দিলে ত্রাণ যে যথাস্থানে পৌঁছবেই — জনগণের এই গভীর আস্থা কমরেডদের মনকে বারবার ছুঁয়ে গিয়েছে। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত তামিলনাড়ুর কাড্ডালোর, নাগপট্টিনম, কন্যাকুমারী; কেন্দ্রশাসিত পণ্ডিচেরি ; কেরালার কুইলন জেলার করুণাগপল্লি ও আলেপ্পি জেলার কায়াংকুলাম এবং অন্ধ্রের মসুলিপট্টনমে পার্টির উদ্যোগে ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে।

ত্রাণের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং যেখানে যে ধরনের ত্রাণসামগ্রী প্রয়োজন তা ঠিকমতো পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে তামিলনাড়ুর সর্বাধিক বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে কর্মীরা গিয়ে সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে এসেছেন। এর ভিত্তিতে একদিকে যেমন দলের ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে ৪ জানুয়ারি চেন্নাইতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেরালার কুইলনের করুণাগপল্লিতে এস ইউ সি আই পরিচালিত ত্রাণশিবির। (ডাইনে) কুইলন উপকূলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত একটি অঞ্চলে কমরেড শিলা কে জনের নেতৃত্বে ত্রাণের কাজে এস ইউ সি আই স্বেচ্ছাসেবকরা।

ভিতরের পাতায়

- বিচারবিভাগও গণআন্দোলনের পথ রোধ করছে
- ডি এস ও সদস্যদের মিলন অনুষ্ঠান
- পশ্চিমবাংলায় উন্নয়ন
- ফালুজায় হামলা

কোথায় ছিলেন এই নেতা-নেত্রীরা ?

দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জয়েন্ট পাশ মেধাতালিকাভুক্ত ছাত্ররা মেডিকেল পাঠক্রমে ভর্তি হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, তাদের বঞ্চিত করে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার অবৈধ পরীক্ষা সাজিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে এন আর কোটায় যাদের ভর্তি করেছিল, এখন তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করছে, যা সে করতে পারে না। সরকারের প্রতারণার শিকার ছাত্রদের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। এ ব্যাপারে এন আর আই ছাত্র ও তাদের অভিভাবকরাও দায়িত্ব এড়াতে পারেননা। তখন তাঁদের বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তাঁরা তাতে কান দেননি। অন্যদিকে এদের ভর্তির দাবিতে রুদালির ভূমিকা নিয়ে এখন মায়াকান্না কাঁদছে কংগ্রেস, তৃণমূল, এমনকী বিজেপিও। সিপিএম নেতাদের অনুরোধে প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আগেই সিপিএম-এর পরামর্শদাতার ভূমিকা নিয়েছেন, সম্প্রতি প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রী অরুণ জেটলি, তৃণমূল মন্ত্রী অজিত পাঁজা ও কংগ্রেসের নরিম্যান রাজ্য সরকার ও সিপিএমের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে এন আর আই ছাত্রদের হয়ে ওকালতি করছেন। সর্বশেষ, আদবানী নিজে এদের হয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ানোর জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ফোন করেছেন। আসরে নেমেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

প্রশ্ন হল, এতদিন পর হঠাৎ তাদের এমন সমস্বরে কেঁদে ওঠার কারণ কী? সিপিএমের প্রতারণার শিকার যে ৬৯ জন ছাত্র এন আর আই কোটায় পিছনের দরজা দিয়ে মেডিকেলে ভর্তি হয়ে আজ অথৈ জলে পড়েছে, সত্যি কি তাদের প্রতি এসব নেতাদের কোন সমবেদনা আছে? তা যদি থাকত তবে ২০০৩ সালে ক্ষমতায় থাকাকালে বিজেপি-তৃণমূল এদের কথা ভাবতে পারত এবং এদের অবৈধ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝে ঝাঁপ দেওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু তা তারা করেনি। এদের ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালে যখন বিজেপি-তৃণমূল জোট কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল। আজ এন আর আই ছাত্রদের জন্য মায়াকান্না কেঁদে যারা ছাত্রদরদী ও ন্যায়পরায়ণ সাজতে চাইছে, ২০০৩ সালে ক্ষমতায় থাকাকালেই তারা জানত রাজ্য সরকার এস এস কে এম ও মেদিনীপুরে দুটি নতুন মেডিকেল কলেজ খুলতে দিল্লির মেডিকেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার অনুমোদন চেয়েও পায়নি। রাজ্য সরকার যে স্বীকৃত জয়েন্টে পরীক্ষা এড়িয়ে অবৈধ ভর্তির

তিনের পাতায় দেখুন

রংধামালিতে
শ্রমিক-কৃষক শিবির

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার রংধামালি বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে শ্রমিক-কৃষক শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এলাকার চা-শ্রমিক ও কৃষক-খেতমজুরদের জীবনের নানা সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে শিবিরে আলোচনা হয়। নতুন চা-বাগানের সমস্ত শ্রমিকের পি এফ চালু, নতুন ও পুরনো সমস্ত চা-বাগানে শ্রম আইন কঠোরভাবে বলবৎ করা, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, ইন্দিরা আবাসন ও বি পি এল কার্ড নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ, রায়পুর সহ সমস্ত বন্ধ চা-বাগানকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ, প্রস্তাবিত সালিশি বিল বাতিল ইত্যাদি দাবিগুলির উপরও আলোচনা হয়। রায়পুর, ডেঙ্গুয়াঝার, জয়পুর, ভান্ডিগুড়ি, অরিহান্ট, শ্রীদুর্গা প্ল্যান্টেশন, মাকালী অ্যাগ্রোপ্রোডাক্ট, কামারপাড়া টি, নিউ রসিয়াবাড়ি টি প্রজেক্ট, ন্যাপাতিভ্যালি, কুড়িয়াটিপিড়ি, ভূষাপাড়া-বানিয়াপাড়া টি ইত্যাদি চা-বাগান ও তার আশপাশ এলাকার প্রায় সহস্রাধিক শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধি শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনাশিবির শুরুর আগে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুনে সুসজ্জিত একটি মিছিল রংধামালি বাজার প্রদক্ষিণ করে। সভার শুরুতেই শহীদবেদীতে মাল্যদান করা হয়। এরপর সুনামিতে নিহতদের স্মরণে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শিবিরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই নেতা কমরেড রবি রায় এবং দাবি সম্বলিত মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন রায়পুর চা-বাগানের শ্রমিক কমরেড রজনী ঘোষ। বক্তব্য রাখেন, কমরেড্স শরৎ রায়, সুরেন রায়, রত্না ওড়াও, হীরেন রায়, বিনয় মল্লিক প্রমুখ। মূল আলোচক ছিলেন কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড হরিভক্ত সর্দার। সমাপ্তি ভাষণ দেন নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক কমরেড তরুণ ভৌমিক। আলোচনাশিবিরে সভাপতিত্ব করেন এলাকার এস ইউ সি আই দলের প্রবীণ সংগঠক কমরেড নরেন্দ্রনাথ রায়।

ওন্দা থানা বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

গত ৫ ডিসেম্বর ওন্দা থানা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জনবহুল ওন্দা বাসস্ট্যান্ডের নেতাজি মূর্তির কাছে। সমাবেশের প্রধান বক্তা অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস আবেগদীপ্ত ভাষণে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষায় অ্যাবেকার লাগাতার আন্দোলনের ভূমিকা এবং উল্লেখযোগ্য জয়গুলি তুলে ধরেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ নীতি তথা বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের নীতিকে পরাস্ত করতে আরও জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান তিনি জানান। তিনি সংগঠনকে আরও বিস্তৃত করতে এলাকার সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহককে সদস্য করা ও আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার আবেদন করেন।

তাছাড়াও এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অমল মাইতি ও জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ।

প্রতিনিধি সম্মেলনে মনসারাম সিংহকে সভাপতি ও জয়দেব করককে সম্পাদকের পদে পুনর্নির্বাচিত করে অ্যাবেকার একটি শক্তিশালী শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

বিড়ি শ্রমিকরা আন্দোলনে

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৭০ হাজার বিড়ি শ্রমিক সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরিসহ নানা সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। মালিকরা বিড়ি শ্রমিকদের নির্মম শোষণ করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুঠছে। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, জেলায় বিড়ি শ্রমিকদের জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণের দাবি সহ ১০ দফা দাবিতে ৬টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যৌথ সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে। জেলার ২৫টি ব্লকে এই যৌথ সংগ্রাম কমিটির ব্লক কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর তমলুক থানার নাইকুড়ি ব্লকের নাইকুড়ি গার্লস স্কুলে সাত শতাধিক বিড়ি শ্রমিকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের জেলা নেতা কমরেড মধুসূদন বেরা ও কমরেড জ্ঞানানন্দ রায় বক্তব্য রাখেন। সিআইটিইউ এবং এআইটিইউসি'র নেতারাও বক্তব্য রাখেন। কনভেনশনে ১২ জনের একটি ব্লক কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

২৬ ডিসেম্বর তমলুক মাতঙ্গিনী ব্লকের গোবিন্দপুর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে ইউটিইউসি-লেনিন সরণীর পক্ষে কমরেড মধুসূদন বেরা তাঁর বক্তব্যে বলেন, সরকার বিড়ি শ্রমিকদের ১০০০ বিড়ি প্রতি ৭৩.৫০ টাকা মজুরি ঘোষণা করলেও এই ব্লকের বিড়ি শ্রমিকরা মজুরি পায় ২২ টাকা থেকে ৩৩ টাকা মাত্র। অথচ ব্লকে ব্লকে সরকার নিয়োজিত ওয়েজ ইন্সপেক্টররা এসব দেখেন না। বেশিরভাগ মালিক এজেন্ট মারফত বিড়ি শ্রমিকদের কাজ করায়। এজেন্টরা নামমাত্র মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের চূড়ান্তভাবে শোষণ করে। শ্রমিকরা অসংগঠিত বলে মালিকরা একাজ করতে পারছে। তিন শতাধিক বিড়ি শ্রমিকের উপস্থিতিতে কনভেনশনে ২১ জনের একটি ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

বাঁকুড়া থানা বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

৪ জানুয়ারি বাঁকুড়া শহরের মনোহরতলায় এস ই অফিসে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে বিদ্যুৎগ্রাহকদের সমস্যাগুলি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার বাঁকুড়া জেলা সংগঠনের সহ-সভাপতি প্রবীণ শিক্ষক কমলাকান্ত কর্মকার ছাড়াও কল্যাণ কুণ্ডু, সন্তোষ কুণ্ডু, আইনজীবী হরিদাস ব্যানার্জী, সংগঠনের জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ প্রমুখ। সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সংগঠনের অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুত চৌধুরী।

প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তা নির্মল মুখার্জী বলেন, "ইঞ্জিনিয়ারের পেশা নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছি এবং যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাতে বলতে পারি, অ্যাবেকা যথার্থই মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। যতদিন আমি বাঁচবো, এই সংগঠনেরই কাজ করে যাবো।"

প্রতিনিধি সম্মেলনে আইনজীবী হরিপদ ব্যানার্জীকে সম্পাদক ও শম্ভু ব্যানার্জীকে সভাপতি করে সংগঠনের বাঁকুড়া থানা কমিটি গঠন করা হয়।

এগরায় বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

আগামী এপ্রিল মাস থেকে বিদ্যুতের বিপুল বর্ধিত মূল্য চালু হচ্ছে। গৃহস্থ ও বাণিজ্যগ্রাহকদের প্রতি ইউনিটে বাড়তি ৪০ পয়সা, শিল্পগ্রাহকদের প্রতি ইউনিটে বাড়তি ৩০ পয়সা ও কৃষিগ্রাহকদের বছরে ৪০০০ টাকা বিদ্যুতের চার্জ দিতে হবে। এর পাশাপাশি বৃহৎশিল্প মালিকদের ইউনিট প্রতি ৫ পয়সা হারে বিদ্যুতের চার্জ কমানো হচ্ছে। বিদ্যুতের এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তে বিদ্যুৎগ্রাহকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যে কত তীব্র তা প্রকাশ পেল ৩ জানুয়ারি এগরা থানা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির সম্মেলনে।

এগরা মিলনী হলে এগরা থানা সংগঠনের সভাপতি কমললোচন কর মহাপাত্র'র সভাপতিত্বে প্রকাশ্য সমাবেশ শুরু হয়। সমাবেশে প্রধান বক্তা রাজ্য কমিটির সদস্য অমল মাইতি, অশোকতরু প্রধান ও এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক এন আর প্রধান, শিক্ষক জগদীশ সাহু, আশুতোষ কুণ্ডু প্রমুখ রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনে কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

কাঁথিতে বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

৪ জানুয়ারি কাঁথির সরস্বতীতলা মাঠে কাঁথি থানা বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অমল মাইতি, অশোকতরু প্রধান, থানা কমিটির সম্পাদক সুশান্ত জানা, থানা সহ-সভাপতি জগন্নাথ দাস প্রমুখ। কাঁথি পৌরসভা কমিউনিটি হলে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মদন পয়ড্যাকে সভাপতি ও সুশান্ত জানাকে সম্পাদক করে অ্যাবেকার কাঁথি থানা কমিটি গঠিত হয়।

এস ইউ সি আই-এর ত্রাণশিবির

একের পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলন করে বিধ্বস্ত এলাকার জনগণের প্রকৃত অবস্থা ও প্রকৃত প্রয়োজন জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যথার্থই যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে ত্রাণ কাজ শুরু করার দাবি জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন — ত্রাণসামগ্রী অনেকক্ষেত্রে স্তূপাকারে পড়ে রয়েছে, বণ্টন হচ্ছে না। দুর্গতদের মধ্যে যাঁরা আশ্রয়স্থল 'মন্ডপম্'গুলিতে ঠাঁই পাননি, তেমন অসংখ্য গরিব মৎস্যজীবী, কৃষক, নাপিত, ছুতোর প্রভৃতি পেশার মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে নিরন্ন-নিরাশ্রয় অবস্থাতেও সরকারি ত্রাণ পাচ্ছেন না। আবার এলাকার মাতব্বর গোছের অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েও ত্রাণসামগ্রী আত্মসাৎ করছে। সুনামি আঘাত করার আগে সতর্কীকরণের জন্য পাওয়া অতীব মূল্যবান কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সময়মতো সতর্ক না করে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সরকার ও প্রশাসন যে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছে, উদ্ধার ও ত্রাণের কাজেও তারা তেমনি অবহেলা করে চলেছে। 'জনগণকে রক্ষা করার' নামে সত্তর হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে যে সেনাবাহিনীকে সরকার পুষছে, জনগণের প্রকৃত বিপদের দিনে সেই বাহিনী বিশেষ কোন কাজেই আসেনি, সরকার সে চেষ্টাও করেনি।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী জানান — ত্রাণশিবির পরিচালনা করে আমরা বুঝেছি এখানে দীর্ঘদিন যে ধরনের ত্রাণ ও পুনর্গঠন দরকার তা করার ক্ষমতা একমাত্র সরকারেরই আছে। তাই সে দাবি আমরা তুলেছি, সাথে সাথে আমরা দেখেছি কেবল খাদ্য ও পানীয় জলই নয়, কেরোসিন, মোমবাতি, রান্নার স্টোভ, দেশলাই, বাসনপত্র — সবই জরুরি দরকার। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ত্রাণের কাজকে আমরা পুনর্গঠিত করছি। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন — লাটুর ও ভুজের ভূমিকম্পে ত্রাণকার্যের সময় আমরা দেখেছি আহত মানুষের সংখ্যা বেশি থাকায় শল্যচিকিৎসক ও ত্রাণশিবিরে ছোট-খাট অপারেশনের ব্যবস্থা করা খুব জরুরি ছিল। কিন্তু সুনামিতে আহত মানুষ অপেক্ষাকৃত কম, তাই দরকার নানা রোগের চিকিৎসা ও আসন্ন মহামারী প্রতিরোধ। তিনি বলেন, বিধ্বস্ত মৎস্যজীবীদের অনেকেই বলেছেন — ত্রাণ নয় আমাদের জাল নৌকা দিন। আমরা ভিক্ষুক হতে চাই না, পরিশ্রম করে খেতে চাই। তাঁদের মর্যাদাবোধ আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে আমরা অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছি। আমরা বলেছি, মৎস্যজীবীদের নৌকা ও জাল, কৃষক ছুতোর নাপিত প্রভৃতি মেহনতি মানুষের মেহনতের যন্ত্রপাতি অবিলম্বে দিতে হবে। আমরা মনে করি — যে সরকার সিয়াচেনের সুউচ্চ হিমবাহে সেনা মোতায়েন রাখতে বছরে ৭০০ কোটি টাকা খরচ করতে পারে, বছরে ৪৫০০ কোটি টাকার অস্ত্র কিনতে পারে, দিল্লিতে সংসদ চালাতে দিনে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারে — সেই সরকার বিধ্বস্ত মানুষকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন অবশ্যই দিতে পারে যদি তার সদিচ্ছা থাকে এবং হৃদয় বলে কোন বস্তু থাকে।

জনগণ যে ত্রাণসামগ্রী ও অর্থ আমাদের দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন তা দফায় দফায় এলাকায় পাঠানো হচ্ছে। গত ৫ জানুয়ারি কলকাতা থেকে ক্যাম্প হাসপাতাল তৈরির তাঁবু চলে গিয়েছে। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ১০,০০০ মানুষের বসতি অধ্যুষিত কাড্ডালোর জেলায় মূল শিবির খুলে দুপাশে দুটি এলাকার আরও ৩০ হাজার মোট ৪০ হাজার মানুষের মধ্যে মূল শিবিরকে কেন্দ্র করে গাড়ি করে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দূরদূরান্তরের, বিশেষত গরিব মানুষ অধ্যুষিত ও দুর্গম এলাকা, যেখানে এখনও অন্য সূত্রে ত্রাণ পৌঁছোচ্ছে না, সেইসব এলাকায় যথাসাধ্য ত্রাণ পৌঁছোনোর চেষ্টা করাই আমাদের লক্ষ্য। গত ৪ জানুয়ারি কেরালার বালিয়াঝিক্কাল-এ নতুন ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। এছাড়া, জনকীয়া প্রতিরোধ কমিটি কায়ংকুলামের পশ্চিমে পুল্লুকুলাংগারা-তে শিবির চালাচ্ছে।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে দেশের সমস্ত রাজ্যেই পার্টি ত্রাণ সংগ্রহ করছে এবং তা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে সাধারণ মানুষ যেভাবে দলের ত্রাণ তহবিলে অকুণ্ঠ সাহায্য দিয়েছেন এবং যে গভীর আস্থা তাঁরা দলের উপর রেখেছেন তার পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে আমরা ত্রাণের কাজ চালিয়ে যাব।

রিক্সা-ভ্যানচালক ও মোটর শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বীরভূম জেলার ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী নলহাটি শাখার নেতৃত্বে বীরভূম রিক্সা ও ভ্যান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তিন শতাধিক সদস্য গত ২২ ডিসেম্বর পুলিশের সার্কেল ইনস্পেক্টরের অফিসে প্রবল বিক্ষোভ দেখান এবং অবিলম্বে রিক্সা ও ভ্যান চালকদের উপর পুলিশি অত্যাচার বন্ধের দাবি জানান। সি আই অফিসের সামনে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ আবদুস সালাম, মজিবুর রহমান, মাসাদুল ইসলাম। তাঁরা বলেন, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর ইউনিয়ন ভাঙার জন্যই সিটুর অঙ্গুলিহেলনে পুলিশ রিক্সা ও ভ্যানচালকদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে দাঁড়াতে হবে, সেজন্য সংগঠনকে মজবুত করতে হবে।

সিআই-এর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন মোটর ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড জাহির সেখ, সভাপতি তেহিদ সেখ, রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়নের কমরেডস্ শুকুর সেখ, রুহুল সেখ, রেজাউল সেখ, নাসিরুদ্দিন সেখ, রহমান সেখ ও দুখু সেখ। সিআই দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

বিচারবিভাগও গণআন্দোলনের পথ রোধ করছে

মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম আজ এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণের পরিণামে বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপকরণগুলি না পেয়ে শোষিত মানুষ বাঁচার দাবিতে সংগঠিত চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বৃহত্তর আন্দোলন যাতে গড়ে তুলতে না পারে সেজন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্র নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করছে। জনগণের মধ্যে ক্ষোভ যত তীব্র রূপ নিচ্ছে তত শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী একের পর এক শোষিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি হরণ করছে। গত ১৭ নভেম্বর ২০০৪ এস ইউ সি আই পেট্রল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিসহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে এবং জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে যে বাংলা বন্ধ ডেকেছিল, কলকাতা হাইকোর্ট তাকে বেআইনি ঘোষণা করে। কলকাতা হাইকোর্ট এই রায় দেয় সুপ্রিম কোর্টের এক রায়কে অনুসরণ করে। ১৯৯৪-'৯৫ সালে কেরালার পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সংগঠন চেম্বার্স অব কমার্স-এর পিটিশনের ভিত্তিতে কেরালা হাইকোর্ট বন্ধবিরোধী রায় দেয় এবং সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায়কেই বহাল রাখে। শোষক বুর্জোয়ারা, আমলারা এবং সমাজের নানা কায়েমী স্বার্থবাদী সুবিধাভোগী শ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থে গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে, বন্ধের বিরুদ্ধে বরাবরই মত পোষণ করেছে। এবার বিচারবিভাগও খোলাখুলিভাবে এদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় বিচারবিভাগও যে আপাত নিরপেক্ষতার আড়ালে মূলত বুর্জোয়াদেরই স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠান, কোর্টের বন্ধবিরোধী রায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

কলকাতা হাইকোর্ট শুধু বন্ধবিরোধী রায় দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বন্ধ ভাঙার জন্য সরকারের যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তারও সার্কুলার দিয়েছে। বন্ধের দিন কাজে যোগ না দিলে বেতন কাটার নির্দেশ দেওয়া; সরকারি দফতর, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, স্কুল-কলেজ খোলা রাখা এবং যানবাহন চালু রাখার জন্য নির্দেশ জারি করেছে। এই ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে কিনা তা সরকারকে আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাতে বলেছে। বন্ধ ভাঙার জন্য সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে কী কী করতে হবে তার নির্দেশিকা কোর্ট দিতে পারে কিনা এ প্রশ্নও উঠছে। প্রশাসনিক (executive) বিভাগের উপর বিচারবিভাগের (judiciary) এই হস্তক্ষেপ তার সীমানার লঙ্ঘন বলেই বিবেচিত হচ্ছে। বিচারবিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ এবং আইনসভা (legislature) — বুর্জোয়া রাষ্ট্রের এই তিন প্রধান স্তম্ভ পরস্পর পরস্পরের প্রভাবমুক্ত হয়ে আপেক্ষিক স্বাধীনতা বজায় রেখে কাজ করবে — ক্ষমতার এই বিভাজন করা হয়েছিল যাতে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু আমাদের দেশে আইনসভা থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীদের প্রশাসনিক ক্ষমতারও অধিকারী করার ফলে আইন ও প্রশাসন এই দুই ক্ষমতা আগেই বহুলাংশে কেন্দ্রীভূত ছিল। এখন প্রশাসনিক বিভাগের উপর বিচারবিভাগের এই হুকুমনামার মধ্য দিয়ে কার্যত প্রশাসনের ওপর বিচারবিভাগের খবরদারি নিয়ে আসা হচ্ছে এবং সেই অর্থে ক্ষমতা বিভাজন নীতির মূল লক্ষ্যকেই লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বিচারবিভাগের এই ভূমিকার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের আবরণে রাষ্ট্রের আরও বেশি বেশি করে স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁকই প্রকট হচ্ছে।

সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনে নৈরাজ্য ডেকে আনে। এই অবস্থায় সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, উৎপাদনে গতিশীলতা আনতে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানো সামাজিক প্রয়োজন হিসাবে দেখা দেয়। ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। এরাই তখন স্লোগান তুলেছিল, স্বৈরতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র চাই। তারা দাবি তুলেছিল — ব্যক্তির শাসন (Rule of person) নয়, আইনের শাসন (Rule of law) চাই। বুর্জোয়ারাই সেদিন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্লোগান তুলেছিল। এই সংগ্রামে শক্তি জোগায় শ্রমিক ও মেহনতি জনগণ। বুর্জোয়া বিপ্লবের আঘাতে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় বুর্জোয়া অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, যাকে বলা হয় জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য জনগণের শাসন।

স্বৈরতান্ত্রিক সামন্তীব্যবস্থা ভাঙার রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে বুর্জোয়ারা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার বিপরীতে ক্ষমতা বিভাজন নীতি এনে আইন, প্রশাসন ও বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন করে প্রত্যেকের কাজের এক্তিয়ার সুনির্দিষ্ট করে দেয়। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থাও যেহেতু শোষণমূলক এবং শোষণমূলক সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য থাকে না বলে সমানাধিকার এবং গণতন্ত্র এখানে বাস্তব ভিত্তি পায়না। ফলে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পুঁজির কেন্দ্রীকরণের পথে একচেটে পুঁজিবাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে গণতন্ত্রের আবরণে স্বৈরতান্ত্রিক চিহ্নগুলিও এই ব্যবস্থার সর্বাঙ্গে ফুটে উঠতে থাকে।

আজ জনগণের কতটুকু গণতন্ত্র এখানে আছে? প্রশাসন আজ শাসকদলের পুরোপুরি আজ্ঞাবহ। সেখানে কতটুকু নিরপেক্ষতা প্রশাসনের আছে? আইনসভা বা পার্লামেন্ট বুর্জোয়া দলগুলির সাংসদদের জনবিরোধী আইন করার জায়গা। কালাকানুন জারি করে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, এই আইনসভাতেই হয়। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রশাসন ও আইনসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে সেখানে প্রশাসন ও আইনসভার ভূমিকা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্জির উপর নির্ভর করে। তাহলে বাকি রইল একমাত্র তথাকথিত বিচারব্যবস্থা — যাকে বলা হয় ন্যায়বিচার ও আইনি সুরক্ষার শেষ অবলম্বন। যখন সরকারি প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন পুঁজিপতিশ্রেণীর দলগুলি জনগণের সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে চূড়ান্ত ঘৃণার পাত্রে পর্যবসিত হয়েছে তখন বিচারব্যবস্থাকে সামনে রেখে পুঁজিপতিশ্রেণী এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে, এই অবস্থায় সেই বিচারব্যবস্থা আজ জনগণের প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিতে এগিয়ে এসেছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পায়ে বেড়ি পরাচ্ছে এবং বন্ধ, যা আসলে সাধারণ ধর্মঘট, তাকেই বেআইনি ঘোষণা করে মালিকপক্ষ এবং বুর্জোয়া সরকারের আক্রমণের সামনে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদহীন করে দিতে উদ্যত হয়েছে।

একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অন্য সবকিছুর মতোই কোর্টও শ্রেণীনিরপেক্ষ থাকতে পারে না। যেকোন সমাজব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থাও সেই সমাজের শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই তৈরি করা হয়। তাই দেখা গেছে, এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে কোর্ট সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের পক্ষেই কাজ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম করার জন্য কোর্টই ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে, নেতাজী সুভাষ বসুকে বারবার কারাগারে নিক্ষেপ করার ফরমান কোর্টই জারি করেছে। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এদেশের বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের পর তার অন্যতম উপরিকাঠামো হিসাবে কোর্টও মূলতঃ বুর্জোয়াব্যবস্থার স্বার্থেই পুনর্গঠিত হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে, এই কোর্টই আজ বন্ধের অধিকার হরণ করছে বুর্জোয়াদের স্বার্থে। শুধু বন্ধই নয়, যখনই দৈনন্দিন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন পুঁজিবাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিয়েছে, তখনই কোর্ট তার বিরুদ্ধতা করেছে। কোর্টই আজ বুর্জোয়াব্যবস্থাকে গণআন্দোলনের আঘাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। এইভাবে কোর্ট প্রত্যক্ষভাবে আজ জনগণের আন্দোলনের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোর্টই আজ জল আর পানির পার্থক্য খোঁজার মতো ধর্মঘট আর বন্ধের পার্থক্য খুঁজছে। কী অর্থে কোর্ট বন্ধকে বলে অসাংবিধানিক? সংবিধান দাবি আদায়ের জন্য প্রয়োজনে সরকারি কর্মচারীদের collective bargaining বা সংগঠিতভাবে দরকষাকষির অধিকার দিয়েছে। এই দরকষাকষি করতে গিয়ে সরকার কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন করা বা ধর্মঘট করার বহু কষ্টার্জিত অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। এই অধিকার এমনি এমনি আসেনি ; সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করতে হয়েছে। এই ধর্মঘটেরই অপর নাম বন্ধ বা জেনারেল স্ট্রাইক। বাস্তবে বিষয়বস্তু (content) এবং রূপ (form), কোনদিক দিয়েই বন্ধ বা ধর্মঘটে পার্থক্য নেই। শুধু নামেই যা পার্থক্য। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, বন্ধ-এ প্রচ্ছন্ন ভীতিপ্রদর্শন বা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটার ও বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে, ফলে তা অসাংবিধানিক। এটা নিতান্ত শিশুসুলভ যুক্তি। কারণ আইনে স্বীকৃত ধর্মঘটেও কখনও কখনও এসব ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে। এরাজ্যে এর বহু উদাহরণ আছে। মালিকের কাছ থেকে দাবি আদায়ের জন্য গড়ে ওঠা আন্দোলনের ওপর মালিকের সংগঠিত হামলা প্রতিরোধের জন্য কখনও কখনও শ্রমিকদের বলপ্রয়োগের ঘটনাও বিরল নয়। মালিকের শ্রমিকবিরোধী কঠোর মনোভাবই এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তোলে। সংগ্রামের ধারায় দাবি আদায়ের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত এবং ব্যবহৃত ধর্মঘটের অধিকার 'বন্ধ' শব্দটির একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিলেই এবং তা 'অসাংবিধানিক' বলে দিলেই তা অসাংবিধানিক হয়ে যায় না। এটা কার্যত জনগণের ধর্মঘট বা বন্ধ করার বহু সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ারই ষড়যন্ত্র মাত্র। বিশ্বের কোনও গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের ধর্মঘট বা বন্ধ করার অধিকার নিষিদ্ধ নয়। আমেরিকার আগ্রাসীনীতির বিরুদ্ধে গত বছর ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। ঐসব দেশের বিচারবিভাগ বা শাসকশ্রেণী ধর্মঘট বা বন্ধকে আজও বেআইনি বলার সাহস দেখাতে পারেনি।

যাঁরা বলছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ, তাঁরা হয় ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অথবা পুঁজিবাদের সচেতন নিকৃষ্ট দালাল। ধর্মঘট বা বন্ধ করা উচিত কিনা, এ প্রশ্নে প্রচলিত আইনের সঙ্গে ন্যায়ের বিরোধের বিষয়টি আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। সামাজিক ন্যায়নীতিবোধ যা করতে বলে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় তার সঙ্গে প্রচলিত আইনের বিরোধ সৃষ্টি হয়। সমাজে ন্যায়নীতি, জুরিসপ্রুডেন্স এবং আইনশৃঙ্খলার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ১৯৬৭ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ''যাহাই আইনসঙ্গত তাহাই সবসময় ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং মানবিকতাসম্মত নাও হতে পারে। আবার কোন জিনিস আইনের চোখে বেআইনি হলেই তা অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অমানবিক হয়না।'' এই অবস্থায় প্রচলিত আইনের সঙ্গে ন্যায়ের বিরোধের মীমাংসা কীভাবে হবে? প্রচলিত আইনের সঙ্গে ন্যায়ের এই বিরোধ অতীতেও সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনবোধের এবং ন্যায়নীতির ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত আইন পাল্টায় না। বিরোধটা এখানেই হয়। মানুষের সমাজের নতুন প্রয়োজন ও ন্যায়নীতিবোধকে স্বীকৃতি দিতে পুরনো আইনের স্থলে নতুন আইন সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে পুরনো আইনকেই আটকে রাখতে চায়। সমাজের অগ্রগতির প্রয়োজনেই তখন পুরনো আইনকে সরাতে হয়, প্রয়োজনে আন্দোলন-সংগ্রাম করেই সরাতে হয়, যেমন করে বুর্জোয়ারা সামন্তী সমাজের আইন পাল্টেছে। এই কারণেই বলা হয় যে, আইনের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য আইন। বুর্জোয়া সমাজে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য আজ যখন সম্পদের বা উৎপাদনের সামাজিকীকরণ একটা বাস্তব প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে, তখন এই সামাজিক সম্পদের ওপর ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থা ও আইনকানুন তাকে বাধা দিচ্ছে। এটাই ন্যায়ের সঙ্গে আইনের বিরোধ হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে। বুর্জোয়া সমাজের উৎখাত এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটাতে হবে এবং সমাজপ্রগতির দরজা খুলে দিতে হবে। এটাই ইতিহাসনির্ধারিত বিজ্ঞানসম্মত পথ।

ফলে আজ গণআন্দোলনের উপর বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা যে সর্বাত্মক আঘাত নামিয়ে আনছে, সেই আঘাতটা পুঁজিবাদের মরণোন্মুখ অবস্থায় বেঁচে থাকার মরিয়া প্রচেষ্টা। গণআন্দোলনে ক্রমাগত আইনি হস্তক্ষেপ তারই প্রকাশ।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আইনি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টসহ বামগণতান্ত্রিক সকল দল ও শক্তিসমূহের আজ তীব্র লড়াই গড়ে তুলতে হবে। বুর্জোয়ারা ঐতিহাসিকভাবে আজ আর গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়াতে পারে না, তাদের অস্তিত্বের সংকট থেকেই তারা গণতন্ত্র হত্যা করবে। গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের জন্য লড়াই ঐতিহাসিকভাবে প্রকৃত সাম্যবাদীদেরই পালন করতে হবে। স্ট্যালিন বহুদিন আগেই একথা বলে গিয়েছেন।

কোথায় ছিলেন এই নেতা-নেত্রীরা?

একের পাতার পর

পরীক্ষা নিচ্ছে তাও তারা জানত। সব জেনেও তারা তখন সিপিএমের অপকর্ম অবাধে চলতে দিয়েছে। কারণ শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, মেধার পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ভর্তি — এসব ক্ষেত্রে সিপিএম তাদের দোসর।

এখন সুযোগ বুঝে তারা ভাব দেখাচ্ছে যেন তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বঞ্চিতের পাশে দাঁড়িয়েছে। অথচ প্রতারিত হচ্ছে জেনেও যেমন তারা সেদিন এন আর আই কোটায় ভর্তি হওয়া ছাত্রদের বাঁচাবার জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় নি, তেমনি প্রকৃত যারা বঞ্চিত, সেই গরিব ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেধা তালিকার ছাত্ররা যখন দিনের পর দিন সরকারি দপ্তরে মাথা ঠুকছে তখন তাদের পাশে ওইসব নেতাদের কাউকে দেখা যায়নি কেন? জয়েন্টে পাশ করা ছাত্ররা গরিব বা মধ্যবিত্ত বলে? এদের অভিভাবকদের প্রভাবশালী উচ্চ মহলে ঘনিষ্ঠতা নেই বলে? মেধা পরীক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েও ঠাঁই না পেয়ে যারা দেখছিল তাদের চোখের ওপর টাকার জোরে অপর একদল তাদের বঞ্চিত করে ভর্তি হচ্ছে — সেই ছাত্রদের কথা এই নেতা-নেত্রীরা বিন্দুমাত্র ভাবেননি কেন?

মেধাতালিকার ছাত্ররা যখন ন্যায্য দাবি নিয়ে দরজায় দরজায় ধর্না দিয়েছে, বিক্ষোভ দেখিয়েছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ-তাচ্ছিল্য সহ্য করেছে, পুলিশের লাঠি খেয়েছে — তখন কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি'র 'ন্যায়পরায়ণ ছাত্রদরদী' নেতারা কোথায় ছিলেন? কর্তৃপক্ষ যখন মেধাতালিকার ছাত্রদের ভর্তির ন্যায্য দাবিতে কান না দিয়ে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; অর্থকৌলীন্যের সদম্ভ আস্ফালনের সামনে নিজেদের দারিদ্র্যকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া যখন তারা পথ পায়নি — তখন এদের পাশে কারা দাঁড়িয়েছে, কারা তাদের লড়াইয়ে নামার পথ দেখিয়েছে, তা এই ছাত্ররা, তাদের অভিভাবকরা এবং রাজ্যের জনসাধারণ জানেন। এও মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সংসদীয় রাজনীতিতে ভোটের স্বার্থে সমবেদনা প্রকাশের রাজনৈতিক ব্যবসা ছাড়া এন আর আই ছাত্রদের জন্য তৃণমূল, বিজেপি বা কংগ্রেসের মায়াকান্নার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

এ আই ডি এস ও'র ৫০ বর্ষে

প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যদের মিলন অনুষ্ঠান

এদেশের ছাত্রসমাজের সংগ্রামী সংগঠন রূপে ডি এস ও-কে গড়ে তুলতে গত ৫০ বছর ধরে যে নেতা-কর্মী-সদস্যরা অনেক ঘাম, এমনকী রক্তও ঝরিয়েছেন, বহু কঠিন পরিস্থিতিতে ডি এস ও'র পতাকা উড্ডীন রেখেছেন, সংগঠনের ৫০ বর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে তাঁরা আসবেন, বলবেন, নতুনরা শুনবেন — এই গভীর প্রত্যাশা নিয়েই ডি এস ও'র বর্তমান কর্মীরা পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধাভরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ২৯ ডিসেম্বরের মিলন অনুষ্ঠানে। যুবভারতী স্টেডিয়ামের গ্যালারিকে ছাদ করে বেশ বড় জায়গা নিয়েই কাপড় ঘিরে আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় হতেই বোঝা গেল, নতুন ও পুরাতন মিলে সংখ্যাটা ৪০০০ ছাড়িয়ে যাওয়ায় স্থানাভাবের সমস্যা হচ্ছে। ডি এস ও'র সংগঠকদের বেশ বিব্রত দেখা গেল, বিশেষত তাঁরা চাইছিলেন না প্রাক্তনদের কোনও অসুবিধা হোক। ঠাসাঠাসি ভিড়ে অনুষ্ঠান শুরু হতেই বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায় দুঃখপ্রকাশ করে জানালেন, অনেক চেষ্টা করেও এর চেয়ে বড় হল তাঁরা পাননি। তাছাড়া এত বড় সর্বভারতীয় একটি অনুষ্ঠানের সবদিক সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতে হলে প্রস্তুতির জন্য যতটা সময় পাওয়া দরকার, ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা তা পাননি, কারণ দলের লাগাতার আন্দোলনে গত কয়েকমাস ধরেই, বিশেষতনভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কর্মীদের নিয়োজিত থাকতে হয়েছে। তিনি বলেন, পূর্বসূরীদের কাছ থেকে শুনব বলেই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি ; তাঁরা এসেছেন, এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নেন সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে এসেছিলেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। ডি এস ও'র সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহুদিনের, ডি এস ও'র বহু শিক্ষা আন্দোলনেই তিনি ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর উদার, মানবদরদী ও সংগ্রামী চরিত্র ছাত্রদের অনুক্ষণ প্রেরণা দিয়েছে। ছাত্রদের মাঝে আবার আসতে পেরে তিনি যে আনন্দিত, একথা জানিয়ে বলেন, ডি এস ও'র সদস্যদের সৌভাগ্য যে, তাঁরা দেশের শ্রেষ্ঠ বামপন্থী দলটির সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ, যে দলের শাখা আজ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ, দেশসেবাকে ব্রত হিসাবে তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। সত্যিকারের মার্ক্সবাদী হও, ক্ষমতার জন্য লালায়িত হয়োনা। ক্ষমতা স্বাভাবিক নিয়মেই করায়ত্ত হবে। আমি বহু বছর এই পৃথিবীতে আছি, জীবনের শেষ বেলায় এটুকুই সান্ত্বনা যে, ভারতের জনগণের স্বার্থ দেখার ও রক্ষা করার মতো একটা শুভশক্তি দেশে বড় হয়ে উঠছে, আমি তা দেখে যেতে পারলাম।

এরপর বক্তব্য রাখেন বর্তমান এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। তিনি বলেন, শুরুতে আমি যখন পার্টিতে আসি, দলের ছাত্রফ্রন্ট এস ইউ সি আই স্টুডেন্টস্ ব্যুরো নামে পরিচিত ছিল। সম্পাদক ছিলেন বর্তমানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত। অসুস্থতার জন্য আজ তিনি এখানে আসতে পারেননি। আমি ঐ স্টুডেন্টস্ ব্যুরোর কর্মী হিসাবে তখন ছাত্রদের মধ্যে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। আমাদের সাংগঠনিক শক্তি বলতে তখন প্রায় কিছুই ছিলনা, কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে যে উন্নত আদর্শ আমরা পেয়েছিলাম, তা সত্য বলে তার শক্তি এত প্রবল ছিল যে, কোনও বিরুদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিকেই আমরা ভয় পেতাম না, যুক্তিতে আমাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না। ১৯৫৪ সালে ডি এস ও প্রতিষ্ঠার পর আমি বেশি দিন ছাত্রফ্রন্টে আর কাজ করিনি। সংগঠনের সমস্ত বিষয় যদিও আমি জানতাম না, তবুও দক্ষিণ কলকাতায় থাকার সুবাদে কলকাতার অন্যতম বৃহৎ কলেজ আশুতোষের ছাত্র ইউনিয়ন কীভাবে কমরেড প্রভাস ঘোষের নেতৃত্বে আমাদের পক্ষে এল, তা আমি দেখেছি। আমি দেখতাম, কলেজ চলাকালীন কমরেড প্রভাস ঘোষ অসীম ধৈর্য নিয়ে দিনের পর দিন হাজরা পার্কে বসে থাকতেন। কালীধন ইন্সটিটিউশনে পড়ার সময়েই তিনি নিজের চেষ্টায় যেসব ছাত্রকে দলে যুক্ত করেছিলেন, যেমন কৃষ্ণ চক্রবর্তী, অসিত ভট্টাচার্য, যাঁরা আজ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, এমন গুটিকয়েক ছাত্র নিয়েই তিনি শুরু করেন। পার্কে বসে তিনি কলেজের ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, আলোচনা করতেন, এবং শেষপর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, কমরেড প্রভাস ঘোষ অদ্ভুত সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আশুতোষ কলেজে ডি এস ও'র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করলেন। আমার জানা মতে, এর দ্বারাই, ক্ষুদ্র হলেও বাস্তবে ডি এস ও'র একটা গণভিত্তি তৈরি হয়। সেদিন যখন আমাদের তেমন কোনও শক্তিই ছিলনা, অন্য সকলেই অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত, সেইসময় আশুতোষের ইউনিয়ন পাওয়াটা বিরাট ব্যাপার ছিল। আজ পার্টির স্তরে স্তরে নেতৃত্বে থাকা বহু কমরেডই আশুতোষের ছাত্র ইউনিয়ন থেকে এসেছেন। মহিলা কর্মীদের মধ্যে কমরেড সাধনা চৌধুরীকে দেখেছি, কী প্রবল বাধা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, কুৎসা ও আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি কলেজে কলেজে ডি এস ও ইউনিট গড়ার চেষ্টা করেছেন। একজন মহিলার পক্ষে এ'কাজ সেদিন সহজ ছিলনা। আজ ডি এস ও অনেক বড় হয়েছে, যা কালকের সমাবেশ প্রমাণ করে দিয়েছে। এই শক্তি উত্তরোত্তর বাড়বে, কারণ এর পেছনে রয়েছে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, এক উন্নত আদর্শ, উন্নত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি। এই উন্নত সংস্কৃতির জায়গাটা আমি বিশেষ করে বলতে চাই। এর উপরই কমরেড ঘোষ সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি উন্নত নৈতিকতার আধারে নতুন মানুষ তৈরির সংগ্রাম নিজের হাতে পরিচালনা করেছিলেন। আর যে দিকটার উপর তিনি জোর দিয়েছেন, তা হল সঠিক পদ্ধতি। কোনও কাজে একসময় খুব সাফল্য এলেও যদি তা সঠিক পদ্ধতি মেনে না হয়, তবে তার ফল শেষ পর্যন্ত ভাল হয়না। ডি এস ও'র নেতৃত্ব যদি নিজেদের জীবনে ও তাদের সংস্পর্শে যারা আসছে, তাদের জীবনে উন্নত সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটাতে না পারে, সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে, এ বিষয়ে সর্বদা খেয়াল না রাখে, আত্মসন্তুষ্টিতে পেয়ে বসে, তবে শক্তি তারা ধরে রাখতে পারবে না। তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ও মূল্যবোধকে আমরা মুহূর্তের জন্যও যেন ভুলে না যাই।

এস ইউ সি আই সেন্ট্রাল স্টাফ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতে একটি বিপ্লবী ছাত্রসংগঠনের জরুরি প্রয়োজন অনুভব করেই ডি এস ও গঠন করার কথা বলেছিলেন। তাঁর চিন্তা ছিল, এই ছাত্রসংগঠন ছাত্রদের নানা দাবি নিয়েই কেবল জঙ্গি আন্দোলনে গড়ে তুলবে না, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলাও এর দায়িত্ব হবে। এজন্য প্রথম যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় কমরেড প্রভাস ঘোষ ও আমি তার যুগ্ম কনভেনর ছিলাম। অসুস্থতার জন্য ও পরে অন্য দায়িত্ব দেওয়ায় আমি আর ডি এসও-তে ছিলাম না। আমি জানি, দীর্ঘ ৫০ বছরের সংগ্রামে ডি এস ও অনেক কিছু অর্জন করেছে, কিন্তু অর্জনের আরও বহু দিক বাকি আছে।

(মঞ্চে বাঁদিক থেকে) কৃষ্ণ চক্রবর্তী, ছায়া মুখার্জী, সুশীল মুখোপাধ্যায়, অসিত ভট্টাচার্য, প্রভাস ঘোষ, অনিল সেন, মানিক মুখার্জী ও রণজিৎ ধর।

বর্তমানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, এ আই ডি এস ও যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান হয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতায় বসে পুঁজিবাদকে সংহত ও বিকশিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেসময় বিশ্ব পুঁজিবাদ তৃতীয় তীব্র সাধারণ সংকটে নিমজ্জিত, ফলে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতীয় পুঁজিবাদও চরম সংকটগ্রস্ত, অর্থনীতির অবাধ বিকাশ ঘটিয়ে বেকার সমস্যার সামাল দেওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমাতে শাসকশ্রেণী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর উপরিকাঠামোর একটি অঙ্গ হল শিক্ষা। সমাজচিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই জায়গা থেকেই স্বাধীন ভারতে শিক্ষার উপর শাসকশ্রেণী একটার পর একটা আঘাত হানতে থাকে। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার সমস্যা ও সংকট যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট থেকেই জন্ম নিচ্ছে এভাবে দেখার ও বোঝার পথনির্দেশ দিয়েছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। সেসময় এ আই এস এফ, পি এস ইউ, ছাত্র ব্লক প্রভৃতি যেসব ছাত্রসংগঠন ছিল, তাদের কারোরই বিচারের এই আধারটা ছিলনা ; তারা রোগের লক্ষণগুলি দেখেছে, কিন্তু মূল কারণ ধরতে পারেনি। ফলে ছাত্র আন্দোলনকে পথ দেখাতে তারা ব্যর্থ হয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও দেখান যে, শিক্ষার সংকটকে দূর করতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, তা পুরনো সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দিয়ে হবে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে 'বন্দেমাতরম' স্লোগান ছাত্রযুবকদের নৈতিক বল ও প্রেরণা দিত, ঐ স্লোগান দিলে জেলে যেতে হত, কিন্তু স্বাধীন ভারতে 'বন্দেমাতরম' বললে চেয়ার পাওয়া যায়, সুবিধা ভোগ করা যায়। এ দিয়ে আজ আর ছাত্র-যুবদের লড়াইয়ের নৈতিক বল আসবে না, তা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না। তাই পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনের জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ নতুন সর্বহারা সংস্কৃতির ধারণা দিলেন। এটাও অন্য কোনও ছাত্রসংগঠনের ছিলনা।

শিক্ষার সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা ও সেজন্য নতুন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন থেকেই ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠা হয়। এবং আদর্শের এই শক্তির জোরেই প্রতিষ্ঠার পর ডি এস ও অতি দ্রুত ছাত্রদের সংগঠিত করে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি বলেন, কোনও মহৎ আন্দোলনই শুধুমাত্র সদিচ্ছার দ্বারা বিকাশলাভ করতে পারেনা। তার জন্য সর্বপ্রথম মহৎ আদর্শ, মহৎ চিন্তা চাই। আবার শুধু আদর্শ বড় হলেই হয়না, তাকে বহন করার যোগ্য হাতিয়ার চাই। ডি এস ও-কে তেমন যোগ্য হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে, সেজন্য নেতা-কর্মীদের যে ধরনের সংগ্রাম জারি রাখতে হবে, সেখানে যেন শিথিলতা না দেখা দেয়।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৫৪ সালে অতি ক্ষুদ্র আকারে যে সংগঠনের জন্ম হয়েছিল, আজ তার এই বিশাল আকার দেখে আমার যে অনুভূতি হচ্ছে, তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অপারগ। আমরা সংগঠন থেকে চলে যাওয়ার পর, সেই সূত্র ধরে পরবর্তী যাঁরা সংগঠনকে আজকের স্তরে এনেছেন, দক্ষিণপন্থী ও মেকি বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলিকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে ডি এস ও-কে আজ দেশের অত্যন্ত শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত করেছেন, তাঁদের আমি অভিনন্দন জানাই। এই অর্জন ক্ষুদ্র নয়, বিরাট। এর উপর দাঁড়িয়ে আগামী ৫০ বছরে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করার লক্ষ্য আপনাদের পূরণ করতে হবে। ডি এস ও'র ছাত্রকর্মীদের দ্বারা সেটা সম্ভব, কারণ এই সংগঠনের সামনে পথ দেখাচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারায় পরিচালিত যথার্থ

সাতের পাতায় দেখুন

ফালুজা দখল করতে যথেচ্ছ মারণাস্ত্র ব্যবহার করেছে আমেরিকা

সম্প্রতি ফালুজা শহরে ইরাকি স্বাধীনতাযোদ্ধা ঘাঁটি ধ্বংস করতে মার্কিন সেনাবাহিনী যে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে তাতে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক অস্ত্র এবং বিষাক্ত গ্যাসের যথেচ্ছ প্রয়োগ করা হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী এইসব রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। গত ১০নভেম্বর, আল কুদ্‌স সংবাদ সংস্থার নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরাকি প্রতিরোধযোদ্ধারা এই সংবাদ দেন। সেইসময় রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

আসলে এই অভিযান চালাতে গিয়ে মার্কিন বাহিনীকে যে অভাবনীয় প্রতিরোধের সামনে পড়তে হয়েছে, তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। সামান্য কিছু ছোট অস্ত্র নিয়েই ইরাকি প্রতিরোধযোদ্ধারা যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বলে খ্যাত মার্কিন বাহিনীকে এ'রকম বেগ দেবে, এ ছিল তাদের চিন্তার বাইরে। তাই তারা চরম হতাশা থেকেই এধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে।

অকুস্থলে থাকা ইরাকি ডাক্তাররা জানিয়েছেন যে, মার্কিন সেনারা ইরাকি প্রতিরোধযোদ্ধাদের উপর যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক অস্ত্র, বিশেষত নার্ভ গ্যাস প্রয়োগ করে। ফলে বহু মানুষ হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে ও এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

এই প্রসঙ্গে আরো বলে রাখা ভাল যে, পেন্টাগন প্রথমে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও শেষপর্যন্ত মার্কিন কর্তৃপক্ষ গত ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তিন সপ্তাহের ইরাক যুদ্ধের সময় ইরাকের উপর কুখ্যাত নাপাম বোমার যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছিল। যুদ্ধে এই ধরনের বোমা ফেলা আন্তর্জাতিকভাবে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রসংঘের কাছে ঐ সময় ইরাকিদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, এই ধরনের হাজার হাজার ক্লাস্টার বোমা ইরাকের উপর ফেলা হয়েছে এবং তার অনেকগুলিই না-ফাটা অবস্থায় অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে পড়ে আছে।

এই ধরনের অমানবিক কাজের ক্ষেত্রে বর্তমানে মার্কিন কর্তৃপক্ষের আরও সুবিধা হয়েছে এই যে, তারা খুব ভালভাবেই জানে প্রচারমাধ্যমে তাদের এই কুকীর্তির কথা কেউ জানতে পারবে না, না তাদের নিজের দেশ আমেরিকা, না বাইরের পৃথিবী। কারণ আল জাজিরা টিভি নেটওয়ার্কের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকেই অন্যান্য পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমও একরকম ভেড়ার মতই এই সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ পরিবেশনের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে। ফলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ আজ আরও বেপরোয়া।

কিন্তু ফালুজা আক্রমণের সময় মার্কিন কর্তৃপক্ষের অমানবিক কাজকর্ম শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শহরের উপর যখন তুমুল বোমাবর্ষণ চলছে, সেইসময় রেড ক্রেশেন্ট-এর কর্মীরা মানবিক সাহায্যের জন্য ওষুধপত্র এবং অন্যান্য সেবামূলক দ্রব্যাদি নিয়ে আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করতে গেলে মার্কিন সেনারা বাধা দেয়। সংবাদ সংস্থা আনসা জানিয়েছে যে, এইসময় মার্কিন মেরিনের কর্নেল গুপ মন্তব্য করেন, "শহরের মধ্যে কোনরকম মানবিক সাহায্য নিয়ে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই। ওখানকার সাধারণ মানুষের জন্য আমরা নিজেরাই যথেষ্ট সাহায্য সরবরাহ করেছি।"

এখন কী ছিল সেই নিজস্ব সাহায্যের স্বরূপ, যা সেদিন ঐ কর্নেল বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন অনুভব করেননি? তা ছিল বস্তুতপক্ষে দিনভর রাতভর ব্যাপক বোমাবর্ষণ, যার ফলে বহু নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটে। শুধু তাই নয়, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া তো দূরস্থান, এমনকী তাদের দেহগুলোকেও বহুক্ষেত্রেই সরানো সম্ভব হয়নি। ফলে রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই মৃতদেহগুলোতে পচন ধরে পরিবেশকে ভয়ঙ্কর দূষিত করে তোলে। অথচ এই পরিস্থিতিতেও মার্কিন কর্তৃপক্ষ শুধু মানবিক সাহায্য নিয়ে আসা রেড ক্রেশেন্টের কর্মীদের গতিরোধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ঐ উচ্চপদস্থ কর্নেল আরও জানিয়েছেন যে, এই তীব্র সংঘর্ষের ফলে কোনও নিরীহ ইরাকি সাধারণ মানুষের শহরের মধ্যে আটকে পড়ার কোন খবর নাকি তাঁর কাছে নেই।

অপরদিকে ইরাকি রেড ক্রেশেন্টের বক্তব্য কী? তাঁদের মুখপাত্র ফিরদৌস আল ইবাদি জানান, "শহরের মধ্যে বাস্তবে এক মানবিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। রোগে ভুগে শিশুদের মৃত্যু ঘটছে, গর্ভবতী মহিলাদের অকাল প্রসব ঘটছে, এবং দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধরা আহত অবস্থায় রাস্তাতেই মারা যাচ্ছেন। এদিকে মার্কিন মেরিনরা শুধু শহরের মুখ্য হাসপাতালটিকেই দখল করে বসে নেই, তারা বেছে বেছে অন্যান্য সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করছে।"

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এখন কোথায় গেলেন রাষ্ট্রসংঘের পরিদর্শকরা এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাজনীতিকবৃন্দ, দেশে দেশে মানবাধিকার উল্লংঘনের ঘটনায় যাঁদের নাকি চোখের ঘুম ছুটে যায়? ইরাকের রাস্তা যখন সাধারণ নাগরিকের রক্তে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে, তখন তো তাদের এতটুকু সরব হতে দেখা যাচ্ছে না! মনে রাখা দরকার, শুধুমাত্র হত্যাকারীরাই যুদ্ধাপরাধী নয়; ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় থেকে যারা হত্যাকাণ্ড নির্বিবাদে ঘটে যেতে দেয় — যুদ্ধাপরাধী তারাও। মানবাধিকারের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধের জন্য এইসব ঘৃণ্য মার্কিন যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় কবে তোলা হবে — অপেক্ষা শুধু সেদিনেরই। (নর্থস্টার কম্পাস)

পরিবহণ যাত্রীদের নিজস্ব সংগঠন গঠিত হল

একের পাতার পর

আশ্চর্যের হলেও এটাই সত্য যে, এই রাজ্যে ডিজেল, পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম ও ঝাড়খণ্ড থেকে দুর্মূল্য। এর কারণ, এই রাজ্যে ডিজেলের উপর বিক্রয় কর আসাম ও ঝাড়খণ্ডের থেকে বেশি। ফলে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ডিজেলের ওপর অনেক বেশি বিক্রয় কর ও সেস্ বসিয়ে একদিকে ডিজেলের দাম প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে এই দামবৃদ্ধিকে অজুহাত করে রাজ্য সরকার ক্রমাগত বাড়াচ্ছে পরিবহণের ভাড়া এবং এর সব দায়ই বহন করতে হচ্ছে গরিব মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষকে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ট্রাম পরিবহণের সাথে ডিজেলের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার বারবার ট্রামেরও ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। এই সমস্ত কারণে দেখা যাচ্ছে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পরিবহণের খরচের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে গড়পড়তা খরচের পরিমাণ বেশী এবং এই খরচও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

ডিজেলের এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাস মালিকদের দৈনিক খরচ কতটুকু বাড়ে, তাতে তাদের লোকসান হয়, না লাভের পরিমাণ সামান্য কমে — এসব বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্ণয় করার কোন বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত পথ সরকার গ্রহণ করে না। বাসমালিকদের দেওয়া মনগড়া তথ্যের উপর নির্ভর করে রাজ্য সরকার বাসমালিকদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ইচ্ছামতো ভাড়াবৃদ্ধির পরিমাণ ও হার ঠিক করে। যাদের প্রতিদিন এই বাড়তি ভাড়া গুণতে হবে সেই সাধারণ যাত্রীদের সাথে আলোচনা করার ন্যূনতম প্রয়োজন সরকার বোধ করে না। অথচ গণতান্ত্রিক রীতিনীতির এটাই হল প্রাথমিক শর্ত।

এই কনভেনশন আরও লক্ষ্য করছে যে, রাজ্য সরকার পরিবহণ শিল্পের মালিকদের উপর অন্যায়ভাবে কর ও জরিমানার হার বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে যা এই শিল্পকে চরম সংকটগ্রস্ত করে তুলেছে। এর সাথে রয়েছে প্রতিনিয়ত পুলিশের হয়রানি। বাস মালিকেরা এই কর ও জরিমানার হার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ও পুলিশ হয়রানি বন্ধের দাবি জানালেও সরকার সেদিকে কর্ণপাত না করে সহজতম রাস্তা ভাড়াবৃদ্ধির পথেই হাঁটতে চাইছে।

কনভেনশন থেকে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে — বাসসহ অন্যান্য পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধি করা চলবে না, ভাড়ার হার পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে যাত্রীকমিটি ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে, বাসমালিকদের উপর থেকে বর্ধিত কর ও জরিমানা প্রত্যাহার করতে হবে, ডিজেলের উপর রাজ্য সরকারের বিক্রয় কর কমাতে হবে এবং সেস্ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে।

৭ জানুয়ারি কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হল-এ অনুষ্ঠিত কনভেনশনে মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ অধ্যাপক কান্তীশ চন্দ্র মাইতি। প্রাক্তন বিচারপতি অবনীমোহন সিন্‌হা বলেন — গণতন্ত্রে প্রতিবাদী কণ্ঠ না থাকলে তা স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। আগে ভাড়াবৃদ্ধির পূর্বে ট্রান্সপোর্ট কমিশন বসত, এখন তাও বসানো হয় না। শুধু পয়সাওয়ালাদের জন্য দেশ চলবে, আর গরিব মানুষকে পুলিশ দিয়ে দমন করা হবে — এ চলতে পারে না। কনভেনশনের প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে জড়িত করে প্রতিবাদ করতে হবে।

অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, বাসস্থান ইত্যাদিতে জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থেই রাষ্ট্রকে ভরতুকি দিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের নীতিতে এগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে রাষ্ট্রের থাকার দরকার কি? কেবল ভাড়া নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা — কোন ব্যাপারেই সরকারের দায় নেই।

আইনজীবী জয়মাল্য বাগচী বলেন, ভাড়াবৃদ্ধির আঘাত যাদের ওপর পড়বে, সেই যাত্রীদের কথা শোনা হচ্ছে না, অথচ এটা শোনা গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। কাজেই ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যাত্রীদের কথা সরকারকে শুনতে হবে। একতরফা ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বেআইনি। যাত্রীদের কথা শুনতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য যাত্রী কমিটি চাই, যে কমিটি রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে যাত্রীদের স্বার্থের কথা বলবে।

আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলি বলেন, জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন নানা রুটে ভাড়াবৃদ্ধি আটকাতে পেরেছে, খানিকটা ভাড়া কমাতেও পেরেছে। কাজেই আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করার জন্য যাত্রী কমিটি গড়ে তোলা খুবই জরুরি।

শিক্ষক আন্দোলনের নেতা সদানন্দ বাগল বলেন, যাত্রী সাধারণের কার্যকরী ও শক্তিশালী সংগঠন না থাকার সুযোগেই সরকার মালিকস্বার্থে খুশিমতো ভাড়া বাড়াচ্ছে। তিনি বলেন, তীব্র আন্দোলনের চাপে তেলের ওপর কেন্দ্রের ও রাজ্যের করের বোঝা, বাসের ওপর রাজ্য সরকারের বর্ধিত কর, পুলিশী জরিমানার যথেচ্ছাচার ও জুলুম বন্ধ করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক কান্তীশ মাইতি আন্দোলনের প্রয়োজনে উন্নত মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেন।

কনভেনশন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে 'সারা বাংলা পরিবহণ যাত্রী কমিটি' নির্বাচিত হয়। বিচারপতি অবনীমোহন সিন্‌হা কমিটির সভাপতি এবং সদানন্দ বাগল সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেলায় জেলায় যাত্রী কমিটি গঠনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে কনভেনশন সমাপ্ত হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর

জেলা হাসপাতালে গণঅবস্থান

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ৬ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হাসপাতাল মোড়ে গণঅবস্থান করে সরকারি স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদ জানানো হয়। রাজ্যের ব্লক স্তর পর্যন্ত সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপের নামে বেসরকারীকরণ করছে। এইভাবে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি চক্রান্তের তীব্র সমালোচনা করে এর বিরুদ্ধে লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক জীবন দাস, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, ডাঃ সন্তোষ মাইতি, মন্মথ দাস, হীরেন্দ্রনাথ জানা, অনিতা মাইতি, নন্দ পাত্র সহ আরও অনেকে।

অবস্থান মঞ্চ থেকে সিএমওএইচ এবং জেলা সভাধিপতির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

নলগড়ায় স্মৃতিবেদী এবং শহীদবেদীর আবরণ উন্মোচন হল

তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা ও এস ইউ সি আই দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির প্রয়াত প্রবীণ সদস্য কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর স্মৃতিবেদীর আবরণ উন্মোচন করা হয় গত ১ জানুয়ারি নলগড়ায় পার্টি অফিসের পাশে। ২০০২ সালের ১ অক্টোবর নলগড়া পার্টি অফিসের মধ্যে সিপিএম ঘাতক বাহিনীর হাতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও এস ইউ সি আই দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড অশোক হালদার ও দলের কর্মী কমরেড মোসলেম মিস্ত্রী। সেই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন দলের নলগড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ভাণ্ডারী ও এ আই ডি এস ও'র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আশা ভাণ্ডারী। এদিন একইসাথে দুই শহীদের স্মরণবেদীরও আবরণ উন্মোচন করা হয়।

কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর স্মৃতিবেদীর আবরণ উন্মোচন করেন এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ইয়াকুব পৈলান। কমরেড অশোক হালদার ও কমরেড মোসলেম মিস্ত্রীর শহীদবেদীর আবরণ উন্মোচন করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী। দুটি বেদীতেই মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড মানিক মুখার্জী, দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার, এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী, কমরেড শঙ্কর ভাণ্ডারী, কমরেড আশা ভাণ্ডারী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী-সমর্থকরা।

এরপর নলগড়া বাজার সংলগ্ন মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড গোবিন্দ হালদার। প্রথমেই কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী স্মরণে এবং কমরেড অশোক হালদার ও কমরেড মোসলেম মিস্ত্রীর স্মরণে দু'টি গান পরিবেশিত হয়। এরপর সুনামি বিধ্বস্ত মৃত মানুষদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় প্রধান বক্তা কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী শুধু তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিপ্লবী আদর্শ ও সংস্কৃতিকে জীবনে প্রতিফলিত করার সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তেভাগা আন্দোলনে তৎকালীন সময়ে সিপিআই-এর নেতারাও কেউ কেউ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা যেটা পারেন নি, ধীরেনবাবু তা পেরেছিলেন। এই আন্দোলনে বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখিনতাকে তিনি যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শকে ভিত্তি করে জীবনসংগ্রাম পরিচালিত করেছিলেন। তাই একজন নিরক্ষর ক্ষেতমজুর হিসাবে জীবন শুরু করে শেষপর্যন্ত এতদঞ্চলের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু শিক্ষিত যুবক সেদিন দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এই আদর্শের জোরেই আজ এস ইউ সি আই শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে গণআন্দোলনের নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসাবে এসে যাচ্ছে। সিপিএম একেই ভয় পায়। তাই তারা বেছে নিয়েছে খুন-সন্ত্রাসের পথ। এই জেলায় বহু নেতা-কর্মীকে তারা খুন করেছে। তারা খুন করেছে কমরেড অশোকের মতো সর্বজনপ্রিয় যুব নেতাকে, খুন করেছে মোসলেমকে। আমি জানি, অনেকেই আজ চোখের জল ফেলছেন। কিন্তু বিপ্লবীদের কাছে চোখের জলের একটাই অর্থ আছে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, 'নিছক শোক প্রকাশের, শুধু হৃদয়াবেগের বিপ্লবীদের কাছে কোন মূল্য নেই — যদি বিপ্লবী না বোঝে, যে জিনিসটায় সে ব্যথা পেল তার যথার্থ তাৎপর্য তাকে জীবনে কী করতে বলে।' এই শিক্ষার ভিত্তিতেই আপনাদের আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। ধীরেনবাবু ও অশোকের অনুপস্থিতিতে যে ফাঁক তৈরি হয়েছে তা পূরণ করার জন্য আপনাদের প্রস্তুত হতে হবে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড শঙ্কর ভাণ্ডারী ও সভার সভাপতি কমরেড গোবিন্দ হালদার। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনিরুদ্ধ হালদারের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। জনসভায় নলগড়া ও আশেপাশের এলাকা থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ সমবেত হয়েছিলেন।

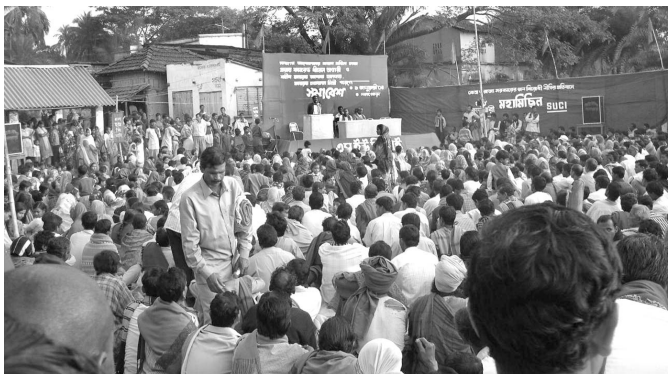

১ জানুয়ারি নলগড়ায় বিশাল সমাবেশের একাংশ

জয়নগরে বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই জয়নগর শাখা কমিটির উদ্যোগে ৩ জানুয়ারি ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ বিডিও'র কাছে এক ডেপুটেশন দেন। বেশ কিছুদিন ধরেই জয়নগর ১নং ব্লকের অধীন বিভিন্ন এলাকায় প্রত্যেকের জন্য রেশন কার্ড, গরিবদের জন্য বিপিএল কার্ড, পঞ্চায়েতি কর ও সালিশি বিল প্রত্যাহারসহ এলাকার উন্নয়নের দাবিতে বুথে বুথে সভা, গ্রামকমিটি গঠন ও ছোট ছোট মিছিল সংগঠিত করা হয়। বিপিএল কার্ড দেওয়ার দাবিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রায় ১৫ হাজার পরিবার থেকে ৭৫ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। বিডিও অফিসের সামনে অনুষ্ঠিত বিশাল সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পাঁচু নস্কর।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে দেশব্যাপী শোকদিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে, সভার শুরুতে 'সুনামি'র তাণ্ডবে মৃতদের স্মরণে বেদীতে মাল্যদান করেন কমরেডস্ দেবপ্রসাদ সরকার (বিধায়ক), ওবায়দুল্লা লস্কর, সুবীর দাস, মহম্মদ মোল্লা, সফি পৈলান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মৃত মানুষদের স্মরণে এক শোক প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড মিনা নস্কর। এক মিনিট নীরবতা পালিত হয়।

ডেপুটেশনে উত্থাপিত দাবি সনদ পাঠ করেন কমরেড সুমন্ত গাঙ্গুলী। উপস্থিত জনতা হাত তুলে তা সমর্থন করেন। কমরেড সহদেব কয়ালের নেতৃত্বে কমরেডস্ অমূল্য সাঁপুই, আয়েনালি মোল্লা, মুজাফর হোসেন গাজি, অমর ঢালী, সুশীল মণ্ডল, হৃষিকেশ মণ্ডল ও শচীন নাইয়া বিডিও'র সাথে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্মারকলিপি দেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড সফি পৈলান, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অজয় সাহা, বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড রূপম চৌধুরী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। কমরেড সরকার উত্থাপিত দাবি সমূহের যৌক্তিকতা এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি এলাকার দাবি ছাড়াও জনজীবনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের স্বার্থে পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং শেষে সুনামি বিধ্বস্ত মানুষের ত্রাণকার্যে সকলকেই যথাসাধ্য দান করার এবং ত্রাণ সংগ্রহে নামার আহ্বান জানান।

প্রতিনিধিদলের পক্ষে কমরেড সহদেব কয়াল সভায় জানান যে, বিডিও মহাশয় দাবিগুলি মেনে নিয়েছেন এবং এজন্য তিনি তাঁর পক্ষে যা করণীয় তা করবেন বলে জানিয়েছেন। উপস্থিত মানুষ করতালি দিয়ে হর্ষধ্বনি করে ওঠেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ২৮শে জানুয়ারি কলকাতার মহামিছিলে সকলকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

৩ জানুয়ারি জয়নগর বিডিও দপ্তরের সামনে অবস্থান

প্রেমচন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী

ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম সাহিত্যিক 'কলম কে সিপাহি' প্রেমচন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৪ মৌলালি যুবকেন্দ্রে ''প্রেমচন্দের জীবনসংগ্রাম ও তার সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল সারা বাংলা প্রেমচন্দ ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটি। সেমিনারে বক্তা ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুধাংশু মালব্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক কাইসার শামীম, বিশিষ্ট কবি ধ্রুবদেব মিশ্র 'পাষাণ', কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ডঃ বি আর মঞ্জুনাথ, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর রায়, জন্মবার্ষিকী কমিটির সভাপতি এবং যোগমায়া দেবী কলেজের হিন্দী বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ এস এন উপাধ্যায় ও সম্পাদিকা সঙ্গীতা মিশ্র।

প্রেমচন্দের জীবনসংগ্রাম প্রসঙ্গে ডঃ সুধাংশু মালব্য বলেন, অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে তিনি সামন্তী কুসংস্কার ও শোষণের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন শুধু নয়, তিনি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও কলম ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। অধ্যাপক কাইসার শামীম বলেন, উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচন্দ যেভাবে সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন তার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও কবি ধ্রুবদেব মিশ্র 'পাষাণ' বলেন, প্রেমচন্দ ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ডঃ মঞ্জুনাথ বলেন, কর্ণাটকে কন্নড় সাহিত্যে প্রেমচন্দের অনুবাদ-সাহিত্য আজও পাওয়া যায় না; কিন্তু সেখানকার লোকমুখে প্রেমচন্দের গল্প-উপন্যাস খুবই প্রচলিত। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর রায় বলেন, প্রেমচন্দ সমাজজীবনের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের উপলব্ধিতেই সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাশিয়ার গোর্কি যেমন লেনিনের মতো নেতা পেয়ে মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করে সর্বহারা সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিলেন, প্রেমচন্দের জীবনেও তেমন সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এদেশে সেসময় একটি সঠিক মার্কসবাদী দল না থাকায় সে সম্ভাবনা পূর্ণতা পায়নি। বক্তব্য রাখেন সাহিত্যানুরাগী বীরেন্দ্র প্রসাদ সিং। প্রেমচন্দ জন্মবার্ষিকী কমিটির সম্পাদিকা সঙ্গীতা মিশ্র কমিটির বিগত দিনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রেমচন্দের প্রতি গভীর আবেগের কথা উল্লেখ করেন। সেমিনারের এবং কমিটির সভাপতি এস এন উপাধ্যায় বলেন, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি এবং বাংলা — এই চার ভাষায় বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনারে একটি অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ চার ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে সেমিনারের বক্তব্য শোনায় তিনি শ্রোতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও সকলের সহযোগিতা পাওয়ার আশা ব্যক্ত করেন। সেমিনারে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেন সভাপতি ডঃ এস এন উপাধ্যায়।

ডি এস ও সদস্যদের মিলন অনুষ্ঠান

চারের পাতার পর

সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই। এজন্য আমাদের সকলকেই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সর্বদিক থেকে নিজেকে পরিবর্তন করার, সমাজ বিপ্লবের স্বার্থ বা প্রয়োজনের সাথে নিজের প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এ পথে সবচেয়ে বড় বাধা, মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রত্যেকের ভিতর থেকে আসছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করেই নিজেদের পরিবর্তন করার প্রক্রিয়ায় আমরা জনগণকেও পরিবর্তিত করতে পারব, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাদের ভাবাতে পারব, তাদের একথা বোঝাতে সক্ষম হব যে, প্রতিটি ব্যক্তিকেই তার নিজের প্রয়োজনকে সামাজিক প্রয়োজনের সাথে একাত্ম করে দিতে হবে, তবেই সমাজ বদলাবে, আমরা সকলে উন্নত সমাজব্যবস্থা পাব।

একদা ডি এস ও'র প্রেসিডেন্ট, বর্তমানে পার্টির বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অরুণ সিং বলেন, আমি ডি এস ও'র সংস্কৃতির দ্বারাই প্রভাবিত হই, তারপর কখন যে সংগঠনের সক্রিয় কর্মী হয়ে যাই, তা নিজেও জানিনা। আজকের এই অনুষ্ঠান আমার কাছে আনন্দের। আবার যে দায়িত্ব আমরা পেয়েছি, তার কতটা পালন করতে পারছি, সেই আত্মবিশ্লেষণ করার সুযোগও এই সভা দিয়েছে।

বর্তমানে পার্টির ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য, কমরেড বিষ্ণু দাস বলেন, ১৯৬৪ সালে ওড়িশায় যখন একটা সম্ভাবনাময় ছাত্র আন্দোলন নেতৃত্বের অভাবে নষ্ট হয়ে গেল, তারপরই আমরা ডি এস ও'র কাজ শুরু করি। ১৯৬৭ সালে রৌরকেল্লায় কমরেড অসিতদা'র উপস্থিতিতে আমাদের নিয়ে প্রথম ডি এস ও কমিটি হয়। ১৯৬৭ সালে ডি এস ও'র নেতৃত্বে বড় ছাত্র আন্দোলন হয়, পাশাপাশি গণআন্দোলনও আমরা শুরু করি। তালচের বিমলাগড়ে রেল সংযোগের দাবিতে আন্দোলন ডি এস ও'র নেতৃত্বেই হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে ডি এস ও'র দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন কটকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ভাষণ দিয়েছিলেন। বর্তমানে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন ওড়িশায় ব্যাপক রূপ নিচ্ছে।

পার্টির দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড জে এন মণ্ডল বলেন, ১৯৬৮ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন কিছুদিনের জন্য দিল্লিতে ছিলেন, তখনই কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর মাধ্যমে তাঁর সাথে আমার কথা হয়। আমার মনের চাপা অনেক দুঃখ ও প্রশ্নের সমাধান পাই কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে কথা বলে, আমি দলের সাথে যুক্ত হয়ে যাই, আমাকে ছাত্রদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমি জীবনে সত্যিকারের ভালবাসা এখানেই পেয়েছি।

পার্টির আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কান্তিময় দেব বলেন, ২৮ ডিসেম্বর হাওড়া স্টেশনে নেমে দেখলাম চারদিকে কেবল ডি এস ও'র ছাত্ররা, মন আনন্দে ভরে গেল। ১৯৬৫ সালে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য আসামে যান, ডি এস ও'র কাজ শুরু হয়েছিল তারপর। আমাদের নেতারা মায়ের স্নেহ দিয়ে আমাদের বড় করার চেষ্টা করেছেন। তরুণ কমরেডদের আবেদন করব — আপনারা ছোটখাটো বিষয়েও কখনও আপস করবেন না, যেমন আমাদের নেতারা করেন না।

বর্তমানে ঝাড়খণ্ড পার্টির সিংভূম জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সরলা মাহাতো বলেন, দূর থেকে কাজ দেখে এস ইউ সি আইকে ভাল লেগেছিল। কলেজের ছাত্রী হওয়ার কারণে ডি এস ও'র কাজ করতে শুরু করি। একা একা ঘুরে যোগাযোগ করে ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রথম জেলা সম্মেলন করি। অল্প সময় ডি এস ও করেছি। আমি যখন কাজ করেছি, তখন মেয়েদের বাইরে বের হওয়ার অসুবিধা ছিল।

প্রাক্তন ডি এস ও নেতা ভবেশ গাঙ্গুলি বলেন, ১৯৫৫ সালে আমি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখন ডি এস ও'র সাথে যুক্ত হই। বহু বছর পার হয়ে গেছে, জীবনের বহু ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে এসেছি। সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারিনি। সেসময় সকাল-সন্ধ্যা প্রভাসদা নজর রেখেছেন। প্রভাসদা, অসিতদা, কৃষ্ণদা'র অফুরন্ত ভালবাসা পেয়েছি, যা না পেলে অন্য পথে চলে যেতাম। ভালবাসার টানেই পার্টিতে এসেছিলাম, আজও সেটাই মূল কথা।

বর্তমানে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিধান চ্যাটার্জী বলেন, ১৯৬১ সালে আশুতোষ কলেজের ছাত্র হওয়ার সুবাদে আমি ডি এস ও'র সাথে যুক্ত হই। সেসময় আমাদের প্রবল অর্থকষ্ট ছিল, খাওয়া-শোয়ার ঠিক ছিল না, কিন্তু পার্টির নেতাদের ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যা প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের পার্টি অফিসে টেনে আনত। আমরা সেদিন বহু আক্রমণ মোকাবিলা করতে পেরেছি। মনে আছে, চারুচন্দ্র কলেজে আমরা জিতব, ভোটের দিন কংগ্রেস-আর এস পি মিলে আমাদের উপর হামলা করছে, বোমা মারছে, পিছনে তাকিয়ে দেখি একদিকে প্রভাসদা, অন্যদিকে ভবেশদা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রভাসদা তখন ডি এস ও'র অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, তিনি নিজে চারুচন্দ্র কলেজ নির্বাচনে গিয়েছেন, কমরেডদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। ডি এস ও পেরেছে, তার কারণ একদিকে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, অন্যদিকে তদানীন্তন ডি এস ও নেতাদের ভূমিকা। এজন্যই ডি এস ও এত বিরাট হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও হবে।

বর্তমানে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ভাস্কর গুপ্ত বলেন, আমার ডি এস ও জীবনের দিনগুলো আমি আনন্দের সাথে স্মরণ করি। কমরেড অসিতদা'র হাতেই প্রথম ধরা পড়েছিলাম, এবং সেই বাঁধন ছিল এতই শক্ত যে ছিঁড়ে বেরোনোর সাধ্য ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ডি এস ও হচ্ছে বিপ্লবের বিদ্যাপীঠ। এখান থেকেই শিক্ষা নিয়ে ছাত্ররা যে আন্দোলন গড়ে তুলবে, তা শোষিত মানুষের মুক্তির বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করবে। তরুণ কর্মীদের বলব — আপনারা ডি এস ও'র আদর্শ বহন করার মতো করে নিজেদের সর্বদিক থেকে গড়ে তুলুন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা কমরেড এম সিরাজ বলেন, কাল শহীদ মিনার ময়দানের সমাবেশে গিয়ে আবার সেই পুরনো দিনের স্বপ্ন যেন ফিরে পেলাম। এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডি এস ও নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা যখন ডি এস ও করেছি, তখনও সমাজমন রাজনীতি করার বিরুদ্ধেই ছিল, কিন্তু অন্যায়কে অন্যায় বলার পরিবেশ ছিল, সেটাও আজ অনেকটা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় ডি এস ও সংগঠকরা যেভাবে গোটা দেশে ডি এস ও'র বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, তাতে তাদের অভিনন্দন জানাতেই হয়।

ডি এস ও'র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি বলেন, একবার ডি এস ও সংগঠকদের এক সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, শুধু ছাত্রদের কিছু দাবি নিয়ে আন্দোলন করার জন্য অনেক সংগঠন আছে, আমি সেজন্য ডি এস ও'কে গঠন করতে চাইনি। রাজনীতিতে যে উন্নত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে নতুন জীবন, নতুন চরিত্র আমি তৈরি করতে চাই, যা না হলে নতুন সমাজ গঠন হবে না, সেই উন্নত বিপ্লবী রাজনীতির বার্তা ছাত্রযুবকদেরই নিয়ে যেতে হবে জনগণের মাঝে, সেই উদ্দেশ্যেই ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠা। তিনি বলেন, এই লক্ষ্য কিছু দূর পর্যন্ত যে সফল হয়েছে, তার প্রমাণ আজ ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে মানুষ যখন একটা নতুন জীবন, নতুন সংস্কৃতির কথা ভাবেন, তখন এস ইউ সি আই-এর কথাই বলেন, ছাত্রসংগঠন বলতে ডি এস ও'র কথাই বলেন।

বর্তমানে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায় বলেন, আমরা যখন ডি এস ও'তে আসি, তখন এই সংগঠন ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে গেছে, বিস্তার ও বৃদ্ধিও ঘটেছে। কষ্টের দিনগুলি তখন নেই। আজও ডি এস ও বাড়ছে। পরিস্থিতি যখন প্রতিকূল থাকে, একটি/দু'টি করে সদস্য-সমর্থক তৈরি করতে যখন প্রবল পরিশ্রম করতে হয়, তখন সংগঠনের ও কর্মী-সংগঠকদের চারিত্রিক মান ধরে রাখাটা তুলনামূলকভাবে কিছুটা সহজ হয়। কিন্তু যখন চারদিক থেকে সমর্থন আসতে থাকে, সহায়সম্পদ যখন বেড়ে যায়, সেসময় আত্মসন্তুষ্টি আমাদের পেয়ে বসতে পারে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ ব্যাপারে সজাগ থাকা আমি অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করি।

এ ধরনের একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানোয় কমরেড অশোক মুখার্জী বর্তমান ডি এস ও নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান।

ডি এস ও'র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে পার্টি সংগঠনের কাজে নিযুক্ত কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী বলেন, আজ পশ্চিমবঙ্গে আমাদের পার্টি যেভাবে আন্দোলনকারী দল হিসাবে জনগণের দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে, ব্যাপক জনগণ এই দলকে জানে, ভালবাসে, আমি এখন উত্তরপ্রদেশে যেখানে কাজ করি, সেখানে পরিস্থিতি এরকম নয়। তবে আমরাও দেখছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা নিয়ে আমরা যতটুকু যেতে পারছি, নতুন নতুন ছাত্র, যুবক, শ্রমিক কৃষক দলের সাথে যুক্ত হচ্ছে। এই বিচারধারার প্রতি মানুষের কী প্রবল আকর্ষণ, তা আমি উত্তরপ্রদেশেও অনুভব করছি।

সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় উপদেষ্টা এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে আমাদের সকলের মধ্যেই আবেগ আলোড়িত হচ্ছে। আমরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য — এ এক নতুন পরিবার। আমাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তাঁর যোগ্য ছাত্র হয়ে ওঠাই আমাদের সংগ্রাম, আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমাদের মধ্যে কেউ সিনিয়র, কেউ জুনিয়র, কিন্তু প্রত্যেকেই একে অপরের থেকে শিখবেন। ডি এস ও আজ বিরাট সংগঠনে পরিণত হয়েছে, গত ৫০ বছরে বহু চড়াই-উৎরাই, ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে ডি এস ও আজ দেশের অগ্রগণ্য সংগঠনে, ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তিতে পরিণত হয়েছে। পরাধীন ভারতে সুভাষ বোস সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ছাত্র আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, স্বাধীন ভারতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের সূচনা করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

তিনি বলেন, উন্নত নৈতিকতা ও সংস্কৃতি অর্জনের জন্য ছাত্রজীবন অত্যন্ত উপযুক্ত সময়। শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলনের তপ্ত প্রবাহে নিজেদের নিয়োজিত করুন। কাঁচা লোহা যেমন আগুনে পুড়ে পুড়ে ইস্পাতে পরিণত হয়, আপনাদের তেমনই নিজেদের ক্রমাগত বিপ্লবী আন্দোলনের আগুনে পুড়িয়ে যথার্থ সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে হবে, নিজেদের ভিতরের বুর্জোয়া সংস্কৃতি, অভ্যাসকে পরাস্ত করে সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে হবে। ক্ষমতা, প্রতিভা সবই সংগ্রামের ফসল, জন্মগত নয়। একজন কী লক্ষ্য, কী সংস্কৃতি নিয়ে, কোন্ আদর্শ ও পদ্ধতিতে সংগ্রাম করছে, তার উপরই নির্ভর করে সে প্রতিভা ও ট্যালেন্টের অধিকারী হবে কিনা। এই প্রক্রিয়ায় সংগ্রাম করে আমরা যে কেউ প্রতিভাধর হতে পারি। এভাবে সংগ্রাম করলে, পরিস্থিতি যেরকম দ্রুত গণআন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের অনুকূলে আসছে, তাতে আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, এ আই ডি এস ও'র শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপিত হবে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কর্নাটকের কে উমা, কেরালার আর ভেনুগোপাল, অন্ধ্রের রমেশ পট্টনায়েক, মধ্যপ্রদেশের ভবানী ঘোষ, উত্তরপ্রদেশের জগন্নাথ ভার্মা। অনুষ্ঠানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মিলন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রকর্মীরা গান, নাটক ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

কমরেড ভোজু সিং লাল সেলাম

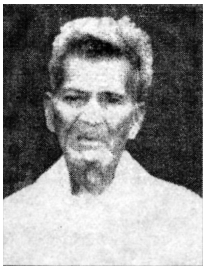

এস ইউ সি আই-এর বিহার রাজ্যের প্রবীণ সংগঠক কমরেড ভোজু সিং গত ১৯ অক্টোবর বাঁকা জেলার বেলহর মহকুমার বারাগ্রামে ৯৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ওই গ্রামেই প্যান্ডাল ভবন সভাগৃহে ৩০ অক্টোবর পার্টির উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিউশঙ্কর, প্রধান বক্তা ছিলেন ঝাড়গ্রাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী। প্রয়াত কমরেডের জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমরেড হেম চক্রবর্তী বলেন — ১৯৫০ সালে হাওড়া জেলায় থাকাকালে তিনি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং বিহারের ধানবাদ জেলার ডিগওয়াডিতে ফিরে দলের কাজ শুরু করেন। পার্টির নির্দেশে তিনি বিহারের ধানবাদ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, বাঁকা প্রভৃতি জেলায় জেলায় ঘুরে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিপ্লবের পথে অবিচল ছিলেন।

পার্টি তাঁকে সংগঠনের কাজে যখন যেখানে পাঠিয়েছে, কোন পিছুটানের পরোয়া না করে তিনি খুশি মনে সেখানেই ছুটে গিয়েছেন। তাঁর কন্যার বিবাহের ব্যবস্থাও করেছে সাধারণ মানুষ। ডিগওয়াডিতে কয়লা খনির মজুরদের মধ্যে কাজ করার সময় তিনি মালিকের গুণ্ডা এবং পুলিশের আক্রমণের শিকার হন। তাঁকে জেলে যেতে হয়। কমরেড ভোজু সিংয়ের জীবন আমাদের কাছে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

স্মরণসভায় পার্টির মুঙ্গের জেলা ইনচার্জ প্রমোদকুমার, কৃষ্ণদেও সাহু, দীপক কুমার, রবীন্দ্র যাদব, কেদার পণ্ডিত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সকলেই বলেন — কমরেড ভোজু সিংয়ের জীবনাবসানে যে ক্ষতি হল, সকলকে আরও মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করার মধ্য দিয়ে সেই ক্ষতি পূরণ করতে হবে। কমরেড সিংয়ের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতির প্রতি সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সিপিএম-ফ্রন্ট শাসনে উন্নয়ন ঃ তথ্য কী বলে

শিক্ষা

★ আগে শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ২৪ শতাংশ, এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ শতাংশ।

★ প্রাইমারিতে ভর্তি হয় ২৭-২৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী; মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে সাড়ে ৫ লক্ষ।

★ পঞ্চম শ্রেণীতে যাওয়ার আগে ড্রপ আউট ৭৩ শতাংশ, মাধ্যমিকে যাওয়ার আগে ড্রপ আউট ৭৮.৭৪ শতাংশ (বর্তমান ১৩-১২-০৪)।

★ প্রাইমারিতে শিক্ষকপদ শূন্য ৪০ হাজার। ৮ হাজার প্রাইমারি স্কুলে ১ জন করে শিক্ষক, ২৫-৩০ হাজার স্কুলে ২ জন করে। ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী সরকারি বই পায় না। ৬০ শতাংশ স্কুলের মাথায় চাল বলে কিছু নেই।

★ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল — ২০০৩ সালের মধ্যে সমস্ত প্রাইমারি স্কুলে মিড ডে মিল চালু করতে হবে। ৫১ হাজার স্কুলের মধ্যে এখনও পর্যন্ত চালু হয়েছে মাত্র ১২০০ স্কুলে (সূত্র ঃ বিপিটিএ)। তাও পচা খাদ্য। আবার বহু স্কুলেই সরকারি দলের পৃষ্ঠপোষকেরা তা বাজারে বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করছে।

★ শিক্ষায় ব্রিটিশ আমলে বাংলা ছিল ১ম স্থানে। কংগ্রেস আমলে হয় ৬ষ্ঠ। বর্তমানে তা ১৮তম।

★ পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪-এ বলা হয়েছে, রাজ্যে ৫৪ হাজার প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ স্কুলেরই ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই। ৭৭ শতাংশ প্রাথমিক স্কুলে শৌচাগার নেই। কলকাতা শহরেই ৪৮টি সরকারি প্রাইমারি স্কুল উঠে গেছে।

★ রাজ্যের ৪৮ শতাংশ মাধ্যমিক স্কুলে শৌচাগার নেই। প্রায় ৩০০০ উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ২৫০০ স্কুলে কোন লাইব্রেরিয়ান নেই (আনন্দবাজার ১৬-৯-০৪)।

★ রাজ্যে ৫১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯০০ স্কুল উঠে গেছে।

★ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে রাজ্যে ৩০ হাজার শিক্ষকপদ শূন্য।

কৃষি

★ ১৯৮৭-৮৮তে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীন পরিবার ছিল ৩৯.৬ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০-এ পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীন পরিবার হয়েছে ৪৯.৮ শতাংশ। অর্থাৎ গ্রামের অর্ধেক পরিবারের হাতে কোন জমি নেই (পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪)।

★ গ্রামাঞ্চলে ৪৫ শতাংশ পুরুষের এবং ৭৯ শতাংশ মহিলার কোন কাজের সুযোগ নেই।

★ জনগণনা রিপোর্ট ২০০১ থেকে দেখা যাচ্ছে, নিজস্ব জমি আছে এমন চাষীর সংখ্যা ৩৮.৪ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২৫.৪ শতাংশ। অন্যদিকে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৪১.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৯.৮ শতাংশ। অর্থাৎ জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

★ ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ শ্রমজীবীদের প্রায় ৩৮ শতাংশ ছিলেন কৃষক, ৩২ শতাংশ ক্ষেতমজুর এবং ৩০ শতাংশ অকৃষিক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক। ২০০১ সালে ক্ষেতমজুরের অনুপাত সামান্য বাড়লেও কৃষকদের অনুপাত কমে দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশ এবং অকৃষিক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের অনুপাত অনেকটা বেড়ে ৪১ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। যাঁরা ভূমি সংস্কারের ফলে জমি কিংবা জমি চাষ করবার অধিকার পেয়েছিলেন, তাঁদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যে সেই জমি কিংবা অধিকার ধরে রাখতে পারেন নি, সেটা সরকারিভাবে মানব উন্নয়ন রিপোর্টেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

★ ক্ষেতমজুরেরা বছরে কাজ পায় মাত্র ১১৪ দিন। ২৫১ দিনই বেকার (পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতি, অজিত নারায়ণ বসু, পৃঃ ১২৪)।

★ গ্রামীণ কর্মক্ষম যুবকদের শতকরা ৮.৪৮ ভাগই রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্র যাচ্ছে কাজের সন্ধানে (ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি ১-৭-৯৮)।

★ কৃষকদের চাষের কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মাশুলের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে।

স্বাস্থ্য

★ রাজ্যের প্রায় ১০০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৬০টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১০০টি গ্রামীণ হাসপাতাল, এবং ১০,৩৫০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, অর্থাৎ মোট প্রায় ১২ হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতাল বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার (আনন্দবাজার ৮-১২-০৪)।

★ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে আর নতুন কোন হাসপাতাল তৈরি করবে না সরকার (আজকাল ১৮-১১-০৪)।

★ ১৪ সেপ্টেম্বর '০৪ গভীর রাতে এস এস কে এম হাসপাতালের চেস্ট ওয়ার্ডে এক রোগীর হাতের আঙুল খুবলে নিয়েছে ইঁদুর। হাসপাতালে সে সময় এ্যান্টি-র‍্যাবিস ইঞ্জেকশনও ছিল না (আনন্দবাজার ১৬-৯-০৪)।

★ ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন এক সমীক্ষায় দেখিয়েছে — পশ্চিমবঙ্গে যত লোক প্রতি বছর হাসপাতালে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ২৫ শতাংশ পরিবার চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে।

★ হাসপাতালের হাল ঃ

নাম	RMO থাকার কথা	RMO আছেন
ক) নীলরতন সরকার হাসপাতাল	১০৫	৬১
খ) আর জি কর	৯২	৫৪
গ) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ	৫৭	৩২

(আনন্দবাজার ৩০-১১-০৪)

★ রাজ্য সরকার ২০০২-০৩ সালে পুলিশ বাজেট বাড়িয়েছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। অন্যদিকে স্বাস্থ্য বাজেটে পরিকল্পনা খাতের খরচ কেটেছে ১৪২ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ এর তুলনায় ২০০৪-০৫ এর রাজ্য স্বাস্থ্য বাজেটের পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ১৪০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।

★ ৯টি জেলার নলকূপের জলে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ। প্রায় ৩ কোটি মানুষ আর্সেনিক বিষযুক্ত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে। ১২ লক্ষ মানুষ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। কয়েকশ' মানুষ মৃত, কয়েক হাজার মৃত্যুর দিন গুণছে।

★ বেশিরভাগ প্রাথমিক ও ব্লক প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার আউটডোরের জন্য রয়েছেন একজন MBBS চিকিৎসক, বেশিরভাগই চুক্তিভিত্তিক, কিংবা হোমিওপ্যাথিক বা আয়ুর্বেদ ডাক্তার। বহুক্ষেত্রেই ফার্মাসিস্টরাই ডাক্তার হিসাবে পরিচিত। যেখানে বেড রয়েছে তাও তুলে দেবার চেষ্টা চলছে। নয়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০২-এর অনুসরণে রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগী ভর্তির ব্যবস্থা বন্ধ করে দিচ্ছে।

★ মহকুমা ও জেলা হাসপাতালের চিত্রও হতাশাজনক। বি সি রায় হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর সময়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে গঠিত তদন্ত কমিটি জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে তদন্ত করার সময়ে লক্ষ্য করেছিল, ৬০-৭০টি বেড পিছু ২টি নার্স, রাতে সেটা কখনো ১ জন হয়ে যায়। চিকিৎসক ১ জন, তাও সব সময় পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যকর্মী ও GDAদের পাওয়া যায় না।

★ রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯৮-৯৯ সালে ছিল ৪৮.৭ শতাংশ, ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ শতাংশ।

টাকার অভাব?

★ ২০০১ সালে এক বছরেই রাজ্য সরকার দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের ট্যাক্স ছাড় দিয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা।

★ ২০০২ সালের ক্যাগ রিপোর্ট ঃ

১। গোয়েঙ্কাকে মকুব করে দেওয়া হয়েছে ২০৪ কোটি টাকা,

২। চালকল মালিকদের ছাড় দেওয়া হয়েছে ২১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা,

৩। শিল্পে উৎসাহ প্রকল্পে দেওয়া হয়েছে ৮৫৫ কোটি টাকা।

৪। বৃহৎ মালিকদের থেকে বিক্রয় কর অনাদায়ী —

৯৬-৯৭ ঃ ৩০৯ কোটি টাকা
৯৭-৯৮ ঃ ৩৪৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা
৯৮-৯৯ ঃ ৩৫০ কোটি ৩০ লক্ষ
৯৯-২০০০ ঃ ১৩৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ
২০০০-০২ ঃ ১৭৪৬ কোটি ৮৭ লক্ষ
মোট ঃ ৪০৮০ কোটি ৫ লক্ষ

৫। বিক্রয়কর স্থির করা হয়নি, মামলায় আটকে আছে, সরকারের তাগিদ নেই — ৮০৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

★ গোয়েঙ্কার সি ই এস সি'র কাছে সরকারি পাওনা — যা গত কয়েক বছর ধরে আদায় করাই হয়নি — ৯০০ কোটি টাকা।

★ ৯৪-৯৫ এবং ৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে আটটি বড় লাভজনক কোম্পানিকে বিক্রয়কর ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৩৯ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।

★ পশ্চিমবঙ্গে পিএফ-এর টাকা আত্মসাতের পরিমাণ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি — ৩২৪ কোটি টাকা। এর পরেই মহারাষ্ট্র ১৬৬ কোটি টাকা।

কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী
স্টল নং - ৩৩০

সুনামি বিধ্বস্ত দুর্গতদের জন্য এস ইউ সি আই ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে সাহায্য করুন

সরকার চাইলে ১৮ টাকায় ডিজেল দিতে পারে

- **বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমছে**
  সর্বোচ্চ — ৫৫ ডলার (২৫ অক্টোবর ০৪)
  বর্তমান দাম — ৪৩ ডলার (৬ জানুয়ারি)
  বর্তমান মাসে গড় দর — ৪২/৪৩ ডলার
  ২ মাস ১০ দিনে কমেছে ১২ ডলার, অর্থাৎ ২১.৮ শতাংশ
- **ভারত আন্তর্জাতিক দরের চেয়ে কম দরে তেল কেনে**
  বিশ্ববাজারে দর যখন ৪২ ডলার ব্যারেল, ভারত কেনে (ইন্ডিয়ান বাস্কেট) ৩৭ ডলার ব্যারেল (স্টেটসম্যান ১৯.১২.০৪)
- **বর্তমান দাম —পেট্রল ৪০.৮৯, ডিজেল ২৮.৭২**
  পেট্রলিয়াম মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ার স্বয়ং রাজ্য সভায় বলেছেন
  সবরকম কর তুলে দিলে দাম হবে
  পেট্রল - ১৭.৪৬ টাকা, ডিজেল - ১৮.০৭ টাকা (প্রতিদিন ৮-১২-০৪)
- **সরকার দাম না কমানোয় ডিসেম্বর মাসের শেষ ১৫ দিনে তেল কোম্পানিগুলি বাড়তি লাভ করেছে ৩৭০ কোটি টাকা** (ইকনমিক টাইমস ১৭-১২-০৪)

মদ্যপ ব্যক্তির মহিলা কামরায় উঠে এক মহিলাকে ফেলে দেওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা কামরায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবিতে ৭ জানুয়ারি বারুইপুর জি আর পি-তে এম এস এস-এর ডেপুটেশন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net